পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি এবং গণতন্ত্র
অতীত ও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে
ভবিষ্যতের নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি
—পৃঃ ২৬

দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

গণতন্ত্র ও সংবিধানের
'মৃত্যুঘণ্টা' বাজিয়ে দিয়েছেন
মমতা—পৃঃ ২৩

৭৩ বর্ষ, ২২ সংখ্যা।। ২৫ জানুয়ারি ২০২১।। ১১ মাঘ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। সাধারণতন্ত্র দিবস বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের সংকট

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

সাধারণতন্ত্র দিবস বিশেষ সংখ্যা

৭৩ বর্ষ ২২ সংখ্যা, ১১ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২৫ জানুয়ারি - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

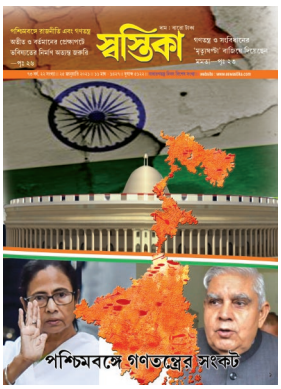

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

দাঙ্গাবাজেরা চিহ্নিত হচ্ছে ▯ ৬

খোলা চিঠি : মোদী নয়, রাহুল হলেন মমতা
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

আমেরিকার নতুন আইনে ভারতের সুবিধা
▯ ব্রহ্ম চেলানী ▯ ৮

তৃণমূলের 'জয়বাংলা' স্লোগান কি গভীর কোনো ষড়যন্ত্রের অঙ্গ? ▯ ড. তরুণ মজুমদার ▯ ১১

রাজ্য শাসনে রাজ্যপালের সক্রিয়তা সংবিধানসম্মত
▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১৪

পশ্চিমবঙ্গে শাসকের নিরপেক্ষতা ডুমুরের ফুল
▯ তথাগত রায় ▯ ১৬

গণতন্ত্র ও সংবিধানের 'মৃত্যুঘণ্টা' বাজিয়ে দিয়েছেন মমতা
▯ সুজিত রায় ▯ ২৩

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এবং গণতন্ত্র : অতীত ও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতের নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি
▯ বিমল শংকর নন্দ ▯ ২৬

ভারতের বাইরে রামায়ণের প্রভাব ▯ স্বপন ঘোষ ▯ ৩১

রাজাপুরের সেই অচিন গাছ ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩২

জয়দেব মেলা মানেই বাউলগানের আসর
▯ প্রদীপ ঘোষ ▯ ৩৩

তৃণমূলি অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বিপন্ন
▯ দেবযানী হালদার ▯ ৩৫

একুশের নির্বাচনে প্রধান ইস্যু উন্নয়ন
▯ সুকল্প চৌধুরী ▯ ৩৬

দেশরক্ষায় সাধু-সন্তের ভূমিকা অপরিসীম
▯ গিরিজাশংকর দাস ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২১ ▯ অঙ্গনা : ২২ ▯ খেলা : ৩৮ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ চিত্রকথা : ৪২ ▯ সমাবেশ সমাচার : ৪৭

প্রকাশিত হবে
১ ফেব্রুয়ারি
২০২১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
১ ফেব্রুয়ারি
২০২১

করোনার ভ্যাকসিন নিয়েও রাজনীতি

রাজনীতির কবল থেকে রেহাই পেল না করোনা টিকাও। প্রথমেই রটানো হলো এটা বিজেপির ভ্যাকসিন। বিরোধীদের এই ভ্যাকসিন দিয়ে ধরাশায়ী করার উদ্দেশ্যে টিকাকরণের অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্র। তারপর প্রশ্ন উঠল, টিকা সম্পূর্ণ নিরাপদ কিনা, ট্রায়াল সম্পূর্ণ সফল হয়েছে কিনা— কিন্তু টিকাকরণ শুরু হতেই সেইসব দলেরই নেতা-মন্ত্রীরা টিকা নিলেন সবার আগে। প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন তারাও স্বাস্থ্য বিভাগের একজন। একদল আবার প্রশ্ন করলেন টিকা প্রথমে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি বা বিজেপি নেতারা নিলেন না কেন। তাহলে কি টিকা নিরাপদ নয়? এইসব মূর্খদের কে বোঝাবে যে প্রথম ধাপে কেবল 'করোনা-যোদ্ধাদের'ই টিকাকরণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে, আর দেশের বিশিষ্ট চিকিৎসকরাও এই ভ্যাকসিন নিয়েছেন যাঁরা আমার আপনার চেয়ে ভ্যাকসিনের গুণমান অনেক বেশি বোঝেন। এদিকে আবার মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশের আবদার, ভ্যাকসিন তৈরিতে শুয়োরের চর্বি ব্যবহার করা হয়েছে, তাই তারা ভ্যাকসিন বয়কট করবে। ধর্মের দোহাই দিয়ে অসহযোগিতা আমরা পোলিও টিকাকরণের সময়েও দেখেছিলাম। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের বিরোধিতা করা এই ধরনের মানুষদের রাষ্ট্রের সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা উচিত।

সব মিলিয়ে করোনা টিকাকরণ অভিযানকে কীভাবে বিপর্যস্ত করার চক্রান্ত চলছে তা নিয়েই আলোচনা করবেন স্বস্তিকার বিশিষ্ট লেখকরা। সঙ্গে থাকবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামত।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-700 071**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত

বিদেশি শাসনের অবসান কল্পে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরিণতিতে আমরা ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশকে গড়িয়া তুলিবার সংকল্প লইয়া বাবাসাহেব আম্বেদকর প্রমুখ সংবিধান রচনা করিয়াছেন।১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি যে সংবিধান গৃহীত হইয়াছে তাহারই নির্দেশিত পথে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে ভারত তাহার যাত্রা শুরু করিয়াছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত। তাই ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোও গণতান্ত্রিক। গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক পরিভাষা। দেশ বা রাজ্য শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার হয়। ইহার অর্থ দেশ বা রাজ্য পরিচালনার জন্য একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যাহাতে সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের জনগণের সমান ভোটাধিকার থাকিবে। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইবেন এবং জনপ্রতিনিধিগণ সরকার পরিচালনা করিবেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান শর্ত হইল সর্বসাধারণের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হইল , একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, সুষ্ঠু ও স্বাধীন জনমত, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচন। সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন যথেষ্ট নয়, নির্বাচন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে হইবে।

অতীব দুঃখের বিষয় হইল, যে স্বপ্ন লইয়া সংবিধান প্রণেতাগণ সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন কাঠামো গঠিত করিয়াছিলেন তাহা পূরণ হওয়া দূরের কথা, দেশের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ বার বার তাহার অমর্যাদা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারে থাকিয়া কংগ্রেস দল বহুবার গণতন্ত্রকে পদদলিত করিয়াছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত বহু রাজ্য সরকারকে তাহারা বহুবার বরখাস্ত করিয়াছে। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করিয়া মানুষের সর্ববিধ অধিকার হরণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস দলেরই প্রতিভূ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সময় হইতে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র পদদলিত হইতে শুরু করিয়াছে। তারপর দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর বাম সরকারের রক্তরঞ্জিত শাসনকাল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাইয়াছে। বাম শাসন হইতে মুক্তির জন্য রাজ্যের মানুষ বড়ো আশা করিয়া বর্তমান শাসকদলকে বরণ করিয়াছিল। কিন্তু অচিরেণ তাহাদের মোহভঙ্গ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। মহিলাদের নিরাপত্তা নাই। শিক্ষক, চিকিৎসকদের সম্মান নাই। বিপক্ষ দলের কাজ করিবার স্বাধীনতা নাই। মানুষের স্বাধীনভাবে ভোটদানের অধিকার নাই । প্রতিবাদ করিলে প্রাণে মারিয়া গাছে ঝুলাইয়া দেওয়া হইতেছে। সবই হরণ করিয়াছে বর্তমান রাজ্য সরকার। এই রাজ্য একপ্রকার নৈরাজ্যের রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও এই রাজ্যের মানুষের গণতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ আস্থা রহিয়াছে। রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ ভীত হইলেও আশা ছাড়িয়া দেন নাই। ইতিহাস সাক্ষী, যখন কোনো শাসক অথবা শাসকদল গণতন্ত্রের অবমাননা করিয়াছে, জনগণ তখন তাহাদের শাসন ক্ষমতা হইতে অপসারণ করিয়াছে। অত্যাচারী শাসকবর্গ ক্ষমতার দম্ভে ভুলিয়া যান যে, গণতান্ত্রিক সরকারের মূল শক্তি হইল জনগণ। গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত করিবার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু যখন সরকার এই দায়িত্বের অবমাননা করিয়া থাকে তখন গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করিয়াই স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটাইতে হয়। ইহাই ইতিহাস নির্দেশিত পথ। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক সেই জনগণের সর্ববিধ আধিকার হরণ করিয়াছে। সাংবিধানিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করিয়াছে। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিতেই হইবে। এই সরকারকে বিসর্জন দিয়া সাংবিধানিক রীতিনীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সংবিধানের প্রতি ইহাই হইবে শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন।

সুভাষিতম্

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে স্বর্গস্যোপরিতিষ্ঠতঃ।

প্রভুশ্চ ক্ষময়া যুক্তো দরিদ্রশ্চ প্রদানবান্।।

জগতে দুই প্রকারের লোক আছেন, যাঁরা স্বর্গের চেয়েও উচ্চস্থান লাভ করেন। এক, যিনি ক্ষমতাবান ও সম্পন্ন হয়েও দয়ালু হন এবং দুই, যিনি নির্ধন হয়েও দান করেন।

দাঙ্গাবাজেরা চিহ্নিত হচ্ছে

বিশ্বামিত্র

দুটি বৈদ্যুতিক সংবাদমাধ্যমে সান্ধ্য বিতর্কের আসর বসেছিল। তাতে মূলত এক সিরিয়ালের অভিনেত্রী দেশের অরাজক পরিস্থিতির জন্য বিজেপিকেই দায়ী করে বর্তমানে দেশে যে 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা' উদ্ভূত হয়েছে সে নিয়ে অনেক কথা বলেন। তাঁর কথাতে এও বোঝা যায়, ওসব রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ নিয়ে আজকের যুব-প্রজন্ম বিশেষ ভাবেটাবে না। তারপরেই প্রকাশ্যে আসে সেই অভিনেত্রীর কয়েক বছর আগে করা কিছু ট্যুইট, যাতে দেখা যায় শিবরাত্রির দিন শিবলিঙ্গে কন্ডোম পরিয়ে এডস নিরোধক প্রচারের আইকন মহিলা প্রতীককে ব্যবহার করে ইংরেজিতে ক্যাপশন লিখেছিলেন : 'এর থেকে কার্যকর হতে পারেন না ঈশ্বর'। অন্যদিকে ইদ ও খ্রিসমাসে কিন্তু যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজের আকুল ভক্তি দেখিয়ে ট্যুইট করেছিলেন তিনি, তাও প্রকাশ্যে আসে। স্বভাবতই সম্মাননীয় নাগরিক হিসেবে তথাগত রায় এবং অসমের একজন অধিবাসীও হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করার অভিযোগ এনে কলকাতা ও অসমের পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। সেই অভিনেত্রী যেখানে বাস করেন, সেই কলকাতা পুলিশ এখন কী ব্যবস্থা নেয় সেটাই এখন দেখার।

প্রসঙ্গত, ইদানীংকালে সেই অভিনেত্রী নিজের অভিনয়ের মরা বাজারে জোয়ার আনবার জন্যই সম্ভবত একটি আদি-রসাত্মক ওয়েব ছবিতে আশালীন যৌন-ভঙ্গিমায় অভিনয়ের হিল্লোল তুলে বেশ নাম করেছেন। যাইহোক, এই সংবাদ, যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখেন, তাঁরা সকলেই অবগত আছেন। এখানে বলার উদ্দেশ্য, হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে সেই অভিনেত্রী কী ধরনের মানসিকতা-সম্পন্ন তা বুঝতে আশা করি কারোর বাকি নেই। সুতরাং তিনি সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে ভাষণ দিলে তাঁর আসল লক্ষ্য কী সেটা দিব্যি বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত, আরেকটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে আরেক পড়তি গায়ক এক বক্তার বক্তব্যের সূত্র ধরে 'ষষ্ঠীতে লুচি, অষ্টমীতে পাঁঠার মাংস' খাওয়ার পাশাপাশি নবমীতে 'বিফ' খাওয়ারও অধিকার চেয়েছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে এক অভিনেত্রী আবার বলেন, তিনি নিরামিষ খান, কিন্তু নাকি চমৎকার 'বিফ' রাঁধতে পারেন। এখানে জানিয়ে দিই, দুর্গাপূজায় বাঙ্গলায় লোকাচারের বিভিন্নতা রয়েছে। সাধারণত, বাঙ্গলার যে মা-বোনেরা দুর্গাপূজায় লোকাচার মেনে ষষ্ঠীতে লুচি খান, অষ্টমীতেও তাঁরা নিরামিষই খান; জমিয়ে আমিষ খান নবমীতে। আবার অনেক জায়গায় লোকাচার মেনেই মা-বোনেরা ষষ্ঠী-অষ্টমীতে আমিষই খান, বিশেষ করে অষ্টমীতে পাঁঠাবলীর মাংস। আমিষ-নিরামিষ রান্নার এই জায়গা- ভিত্তিক বিভিন্নতা আমাদের ধর্ম-সংস্কৃতিরই একটা অঙ্গ। তবে 'বিফ' খাওয়ার কথা বলতে গেলে আমাদের স্থির বিশ্বাস নিশ্চিত জুতোপেটা জুটবে।

এবার গায়কের প্রসঙ্গে আসি। তিনি একদা 'ব্যান্ডে'র হয়ে গান লিখতেন, গাইতেনও বটে। সেই গানের যে কথা লেখা হয়েছিল, সুর দেওয়া হয়েছিল, যা গায়কী ছিল বাঙ্গালির গানের স্বর্ণযুগের সঙ্গে তুলনায় গেলে তাকে অপসংস্কৃতি বলেই মনে হবে। তিনি এখন এক সংবাদপত্রের বেতন-ভুক। যে সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ একদা চিটফান্ডের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিল, প্রধান কর্মচারী তো চিটফান্ড-খ্যাত, মালিকও এই বিষয়ে অভিযুক্ত হয়ে জেলে ছিলেন। ওই টেলি- অভিনেত্রী তাঁর অভিনয়ের সুবাদে কোনোকালেই দাগ কাটতে পারেননি। অবশ্যই মশলার বিজ্ঞাপনের সুবাদে তিনি যে রাঁধতেও জানেন, সেকথা লোককে জানান দেন। এখন বলার বিষয়, এঁদের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ, কৌতূহল নেই। টাকার জন্য মানুষ কী না করতে পারে। শুধু দু-চার কথা বলতেই হলো, কারণ এই ধরনের বক্তব্যের পর এদের 'বাঙ্গালি আইনকন' হিসেবের কারণ প্রতিষ্ঠা চলছে। এককালে রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ বাঙ্গালির আইকন ছিলেন। পরে শক্তি চট্টোপাধ্যায়-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের মতো কমিউনিস্ট কবি কাম বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাব ঘটল। এদের মনোবাসনা সুনীলের কবিতার লাইনে উঠে আসে : 'তিন জোড়া লাথির গায়ে রবীন্দ্র-রচনাবলী লুটোয় পাপোশে।' এরাই এবং তার পরবর্তীতে শঙ্খ ঘোষ, জয় গোস্বামী, পবিত্র সরকার প্রভৃতি এদের চ্যালা-চামুণ্ডারা বাঙ্গলার বুদ্ধিজীবী জগৎ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। এদের তাও 'আদর্শ' (সেটা যতই দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হোক না কেন) বলে একটা ব্যাপার ছিল। এখন উপরোক্ত যে গায়ক-অভিনেত্রীদের কথা বলা হলো, তাদের হাতে বাঙ্গলার বৌদ্ধিক জগতের হাল কী হতে পারে, আপনারাই ভেবে দেখুন।

যোগ্যতার ভাঁড়ারে টান পড়লেই এদের কাজ প্রকাশ্যে গোরু খাওয়ার পক্ষে সওয়াল করা। আরেক অপকবি তো বলা-কওয়ার অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি রাজাবাজারে প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ মাংস গ্রহণ করে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' রক্ষা করেছিলেন। ঘরপোড়া হিন্দুরা অতীতে, এমনকী সাম্প্রতিক অতীতেও এরকম 'সম্প্রীতি'র বিস্তর নজির দেখেছেন। প্রতিক্রিয়ায় যাদের 'দাঙ্গাবাজ' তকমা দেওয়া হয়, সেই বিজেপির রিঅ্যাকশানটি ভেবে দেখুন— ধর্মতলায় বিলি করা হয়েছিল গোরুর দুধ। মনে হয়, এবার দেওয়াল লিখনটা পড়ে ফেলা দরকার। স্বাধীনতার কাল থেকে নেহরুপন্থী সংস্কার আমাদের শিখিয়েছে, পড়ে পড়ে মার খাওয়া, সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষার নামে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার মতো কার্যকলাপেই আমাদের সম্প্রীতি-বোধ চাগিয়ে ওঠে। কিন্তু জমানা বদলেছে, প্রধানমন্ত্রীর ডাকে আত্মনির্ভর ভারত দেখতে চাইলে আত্মমর্যাদাটাও কিন্তু ভীষণ দরকারি। তার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত দাঙ্গাবাজদের চিহ্নিত করা। |

স্বাধীনতার কাল থেকে নেহরুপন্থী সংস্কার আমাদের শিখিয়েছে, পড়ে পড়ে মার খাওয়া, সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষার নামে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার মতো কার্যকলাপেই আমাদের সম্প্রীতি-বোধ চাগিয়ে ওঠে। কিন্তু জমানা বদলেছে, প্রধানমন্ত্রীর ডাকে আত্মনির্ভর ভারত দেখতে চাইলে আত্মমর্যাদাটাও কিন্তু ভীষণ দরকারি। তার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত দাঙ্গাবাজদের চিহ্নিত করা।

মোদী নয়, রাহুল হলেন মমতা

প্রিয় দিদিমণি,

নতুন বছরের অভিনন্দন। এই বছরে আপনাকে আমার এটাই প্রথম চিঠি। আর সেই চিঠি লিখতে বসেছি ঠিক আপনার চমক দেওয়ার পরে পরেই। চমক মানে আপনার নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণার পরে।

খুব ভালো করেছেন দিদি। আপনার জয় পাওয়াটা খুব দরকার। পশ্চিমবঙ্গে আগে কোনও মুখ্যমন্ত্রী এমন করে দুটো আসনে দাঁড়াননি। সেই হিসেবে আপনি একটা রেকর্ড গড়ছেন। সত্যি দিদি, ভবানীপুর একদমই নিরাপদ জায়গা নয়। নন্দীগ্রামও হয়তো নয়। তবু একটা আলাদা জায়গা তৈরি করে রাখা ভালো। কারণ, কিছুই তো বলা যায় না। ঠিক যেমনটা করেছিলেন রাহুল গান্ধী। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে বুঝতে পেরেছেন আমেঠি আর পারিবারিক সম্পত্তি নেই। তাই কেরলের ওয়াইনাড় কেন্দ্রে চলে গিয়েছিলেন। ভুল করেননি রাহুল। স্মৃতি ইরানির কাছে আমেঠিতে হেরে গেলেও ওয়াইনাড় তাঁকে লোকসভায় যাওয়ার প্রবেশপত্রটা দিয়ে দিয়েছিল।

দিদি, আপনি হয়তো বলবেন, নরেন্দ্র মোদীও তো ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দু'জায়গা থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। গান্ধীনগর ও বারাণসী। তবে ফারাক আছে। সেবার দুই কেন্দ্র থেকেই তিনি বিপুল ভোটে জিতেছিলেন। তবে কেন তিনি দুই কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছিলেন? মনে রাখতে হবে তখনও পর্যন্ত গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গান্ধীনগর কোনও কঠিন আসন ছিল না। কিন্তু তিনি ততদিনে সর্বভারতীয় নেতা। দেশের সবচেয়ে বড়ো রাজ্য উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রার্থী হয়ে নিজের সেই জাতীয় নেতার ইমেজটাই তুলে ধরা প্রাধান্য ছিল মোদীর কাছে। তবে নিজভূমি গান্ধীনগরকেও তিনি ছেড়ে যেতে চাননি। সেখানকার মানুষের আবেগকে মর্যাদা দিয়েছিলেন।

কিন্তু রাহুলের বিষয়টা ছিল আলাদা। মনে রাখতে হবে, কেরলে কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ বিজেপি ছিল না। এলডিএফের শরিক সিপিআই-এর সঙ্গে লড়াই অনেক সহজ ছিল গান্ধী পরিবারের প্রতিনিধির কাছে। সেই সঙ্গে ২০০৯ ও ২০১৪ সালে ওয়াইনাড়ে এলডিএফ ভোট পেয়েছিল যথাক্রমে ৪২.৩১ শতাংশ এবং ৩৮.৯ শতাংশ। কংগ্রেসের এমআই শানবাসের পরেই স্থান ছিল তাদের। অন্যদিকে, বিজেপি সেখানে দু'বারই ভোট পেয়েছিল ১০ শতাংশের কম। ২০১৯ সালে ওয়াইনাড়ে তাদের কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই ধরেনি। সবচেয়ে বড়ো কথা, যে সাতটি বিধানসভা নিয়ে রাহুলের লোকসভা কেন্দ্র, তার মধ্যে তিরুবামবাড়ি এবং এরনাড বিধানসভা কেন্দ্র দু'টি কংগ্রেসের সঙ্গী মুসলিম লিগের দুর্গ বলে পরিচিত। যার সুফল পেয়েছেন রাহুল।

কিন্তু সেই সুবিধা কি নন্দীগ্রামে আপনি পাবেন দিদি? শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরে আপনি যে আর তাল সামলাতে পারছেন না সেটা নন্দীগ্রামের বক্তৃতাতেই বুঝিয়ে দিলেন। একবার বললেন, ভাবছি তারপর বললেন হতে পারে, তারপর বললেন প্রার্থী হচ্ছি। আবার বললেন ভবানীপুরে ভালো কোনও প্রার্থী দেবেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আবার বললেন, দু' জায়গাতেই দাঁড়াতে পারেন। তার পরে আবার বললেন, দুই আসন থেকেই লড়ব। খুব কনফিউসড লাগছিল আপনাকে। শুভেন্দুকে আপনিই ওই কথাটা বলার সুযোগ করে দিলেন যে, 'তৃণমূল প্রাইভটে লিমিটেড কমিটি। দেড় জনের পার্টি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাননীয়া কোম্পানির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিলেও আমি তা পারি না। বিজেপিতে তা করা যায় না। কিন্তু দল আমাকে প্রার্থী করুক বা অন্য কাউকে, পদ্ম প্রতীক নিয়ে যে-ই লড়ুক, মাননীয়াকে হারাবই হারাব! হাফ লাখ ভোটে না হারাতে পারলে রাজনীতিই ছেড়ে দেব।'

তবে দিদি, আমি বলছি নন্দীগ্রামের লড়াই কঠিন হলেও ঠিক করেছেন। টিকিট নিয়ে নিন ওই আসনের। কারণ, ভবানীপুর আর আপনার সঙ্গে থাকবে বলে মনে হয় না। ২০১১ সালের উপনির্বাচনে প্রথমবার ভবানীপুরের বিধায়ক নির্বাচিত হন আপনি। ২০১৬ সালে ফের জয়ী হন। সেবার ভবানীপুরে তৃণমূল ৪৭.৬৭ শতাংশ এবং বিজেপি পায় ১৯.১৩ শতাংশ ভোট। কিন্তু ২০১৯ সালে ছবিটা অনেকটাই বদলে যায়। লোকসভা নির্বাচনে ভবানীপুর বিধানসভায় বিজেপির ভোট প্রাপ্তির হার প্রায় তৃণমূলের সমান সমান। আপনার দল যেখানে ৪৫.৫২ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, সেখানে বিজেপি পায় ৪৩.১৬ শতাংশ ভোট।

তাহলে নন্দীগ্রাম কি খুব সহজ জমি? ২০১৬ সালে ৬৭.০২ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন আপনার শুভেন্দু। বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ৫.৪০ শতাংশ ভোট। কিন্তু গত লোকসভায় আপনার দলের ভোট কমেছে। বিজেপির ভোট লাফিয়ে বেড়েছে। তৃণমূল পেয়েছিল ৬৩.১৪ শতাংশ এবং বিজেপির ভোট প্রাপ্তির হার বেড়ে হয় ৩০.০৯ শতাংশ। তখনও শুভেন্দু আপনার সঙ্গে। এবার আপনি একা। উলটো দিকে নন্দীগ্রামের শুভেন্দু। শক্তি বাড়ানো বিজেপি।

আমি বলি কী, এই পরিস্থিতিতে আরও একটা কেন্দ্র আপনার বেছে রাখা উচিত। কোন জেলায়, কোন কেন্দ্র হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিরাপদ? না, দিদি সেটা আমি বলতে পারব না। পিকে দাদার পরামর্শ নিন।

আমেরিকার নতুন আইনে সুবিধা ভারতের

ব্রহ্ম চেলানী

তিব্বত সম্পর্কে চীনের অবস্থানকে সমর্থন থেকে বিরত থাকা চীনের আক্রমণাত্মক হিমালয়ান অঞ্চলের সংশোধনবাদকে থামাতে এবং উত্তরভারতের বেশিরভাগ জলের জন্য নলের কলের ছিপির নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনাকে চ্যালেঞ্জ করতে সহায়তা করার জন্য এটা প্রয়োজন। সতর্কতার সঙ্গে তার তিব্বত নীতি পুনরায় সংশোধন করে ভারত তিব্বতকে আন্তর্জাতিক কৌশলগত ও পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে উন্নীত করতে।

আমেরিকা 'টিবেটান পলিসি অ্যান্ড সাপোর্ট অ্যাক্ট' (TPSA)-কে বর্তমানে আইনে পরিণত করেছে। এই নতুন আইনে তিব্বতের ভূরণনৈতিক (Geostratagic) নীতির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এশিয়া মহাদেশের বিখ্যাত নদীগুলির উৎস- সম্পর্ক এই নীতির অন্যতম প্রধান অভিমুখ। TPSA আইনে তিব্বতীয় ধর্মগুরুদের নির্বাচন, দালাই লামার উত্তরাধিকারের খোঁজ ইত্যাদি চীনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা তিব্বতীয়দের মতামতের ভিত্তিতে করা হবে। এই আইনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, তিব্বতীয়রা যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাতে চীনের আধিকারিকেরা নাক গলাতে পারবেন না। এখন প্রশ্ন হলো, চীনের বিরুদ্ধে ভূরণনৈতিক কৌশল পরিবর্তনে এই আইন কি ভারতকে সাহায্য করবে?

তিব্বত স্পষ্টতই ভারত ও চীনের মধ্যস্থিত বাফার স্টেট। TPSA-র গুরুত্ব এখানেই। কারণ ভারত তিব্বতীয় ধর্মগুরু দলাই লামা এবং তাঁর অনুগামীদের আশ্রয় দিয়েছে। এর ফলে তিব্বতের ভাষা ও সংস্কৃতি চীনের আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং সেই সঙ্গে তিব্বতের স্বাধীনতার দাবিও জীবিত রয়েছে। মনে রাখতে হবে, ১৯৫১ সালে চীনের তিব্বত-দখলের আগে পর্যন্ত ভারত ও তিব্বতের সীমান্ত শান্তিপূর্ণই ছিল। তিব্বত দখলের এগারো বছর পর চীন ভারতের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

তিব্বতের চাইলিজনাম 'ঝিঝাং' অথবা 'ওয়েস্টার্ন ট্রেজার রিপোজিটরি' (গুপ্তধনের খনি)-কে অর্থাৎ এই বিশাল প্লাচুটির গুরুত্বকে কম মূল্যায়ন করা হয়েছে। তাচ্ছিল্য করা হয়েছে এর বিশাল খনিজ ও জনসম্পদকে বর্তমানে যা চীনের দখলে। গত ২৯ আগস্ট প্রেসিডেন্ট শি-জিং-পিং তিব্বতকে এক অভেদ্য দুর্গরূপে গঠন করতে উদ্যোগ নিয়েছেন, এর সীমানা সুরক্ষিত করারও নির্দেশ দিয়েছেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের দমনমূলক নীতি ঝিংঝিয়াং, মধ্যমঙ্গোলিয়া এবং বর্তমানের হংকং-এ ব্যবহার করার আগে তিব্বতীয়দের উপর দিয়ে শানিয়ে নিচ্ছে।

ভারতকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে, তিব্বতের যে অবস্থান চীনের ইচ্ছানুযায়ী তৈরি করা হয়েছে, তা চীনাদের কৌশলকেই উৎসাহিত করছে। চীনের বর্তমানকালের আক্রমণের প্রেক্ষাপটে আপাতকালে মাসাধিক কালব্যাপী বরফাবৃত হিমালয় অঞ্চলের অচলাবস্থায় এক লক্ষের বেশি ভারতীয় ও চীনা সেনার অবস্থান চালু রয়েছে। হান চাইনিজ সম্পর্কের ভিত্তিতে নয় বরঞ্চ তিব্বতের আধ্যাত্মিক ও শিক্ষামূলক সংযোগের ভিত্তিতে আজ চীন ভারতের অঞ্চল দাবি করছে। স্পষ্ট কথায়, লাদাক, উত্তরাখণ্ড, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশের চীনের অধিকার দাবি তিব্বতের উপর দাবির ভিত্তিতে করা হচ্ছে যা ভারতের আত্মবিরোধের নীতি থেকে সত্য কিন্তু স্বীকৃতি দিয়ে ফেলছে।

বাস্তবে তিব্বতে ভারতের সম্পর্কে চীন ২০০৩ সালের চুক্তিকে উল্লেখ করে যেখানে ভারত স্বীকার করে নিয়েছে তিব্বত এক স্কন্ধকাটা অঞ্চলের মতো (cartographically truscated) এবং বেজিং দাবি জানাচ্ছে যে তিব্বত People Republic of China-র অধীনস্থ এক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। এই স্বীকৃতি চীনকে নীতিগতভাবে এগোতে সাহায্য করছে ভারতের বিরুদ্ধে সালানিক স্লাইসিং-এর মতে অল্প অল্প করে খাওয়ার চীনা কৌশলকে। একই সঙ্গে অরুণাচলকে 'দক্ষিণ তিব্বত' তকমা দিতে এবং ক্রমে ভারতের ভূখণ্ডকে অধিকার করতে।

কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে চীন, শর্তমতো চুক্তিতে উল্লেখিত যে সীমানার

উভয় প্রান্তে কেউ সৈন্য বা আগ্রাসন করতে না পারার শর্ত লঙ্ঘন করে চলেছে। একতরফা ভাবে চীনের এই চুক্তি লঙ্ঘনের বিরোধিতা সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার শর্ত এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার স্পষ্টকরণের পক্ষে কাজ করার পরিপন্থী।

এদিকে আন্তর্জাতিক আইনে এটিকে অবৈধ বলে উল্লেখ করে চীন যখন জেনে শুনেই এই চুক্তিটিকে লঙ্ঘন করছে সেক্ষেত্রে ভারতকে মেনে চলার জন্য চাপ দেওয়ার জন্য চীনাদের কাছে কোনো আইনগত অবস্থান নেই। নতুন দিল্লি বারবার জানিয়েছে যে লাদাখে চীন তার আগ্রাসন করে চুক্তি বিরোধের সমস্ত রকমের শর্ত ভঙ্গ করছে, সীমান্তে শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে যা দু-দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে চীনের ব্রহ্মপুত্র মেগা-প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা ভারতকে আনুকূল্য ও সচেতন করছে তার তিব্বত নীতির অবস্থানের পুনর্বিচার বিবেচনা করতে। ভারত ছাড়া আর অন্য কোনো দেশ চীনের এই আন্তঃসীমান্ত জলপ্রবাহে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, কারণ সমগ্র গতিপথে ৪৮.৩৩ শতাংশ অংশ চীনের অধিকৃত স্থলভাগের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। চীনের এক কমিউনিস্ট প্রকাশনায় ভারতকে মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে কীভাবে চীন আন্তঃসীমান্ত জলপ্রবাহকে 'অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করতে এবং চূড়ান্তভাবে ভারতের অর্থনীতিকে 'শ্বাসরোধ' করতে পারে।

যেখানে তিব্বতবাসীরা দলাই লামার দীর্ঘজীবন কামনার জন্য প্রার্থনা করছে সেখানে শি জিং পিং অবৈধভাবে অপেক্ষা করে আছে কতক্ষণে তার মৃত্যু হবে তার জন্য, যারপর তাঁর উত্তরসূরিরূপে এক পুতুল ধর্মগুরু নিযুক্ত করতে। যেভাবে চীন পঞ্চলামা প্রতিষ্ঠান দখল নিয়েছে। তার পরিকল্পনাকে হতাশ করতে ভারতের উচিত নির্বাসিত তিব্বতীয়দের সাহায্য করে তাদের উত্তরাধিকারের নিযুক্তি ও সুরক্ষা করা। দলাই লামা বলেছেন যে, তার পুনর্জন্ম ঘটবে এক স্বাধীনদেশে যার মানে বলতে চেয়েছেন ভারতের তিব্বতীয়-বৌদ্ধ হিমালয় অঞ্চল।

এক্ষেত্রে ভারত তার নিজস্বার্থে অগ্রিম সাহায্য করা উচিত। ভারতের উচিত হিমালয় অঞ্চলকে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে 'ইন্দো-টিবেটান সীমান্ত 'উল্লেখের দ্বারা জোর দিতে, যে মালভূমিটি স্বায়ত্তশাসনের প্রদানের চীনের আশ্বাসের (বা ভেঙে গেছে) পিছনে তিব্বতের উপর চীনের দাবি করার পূর্বাভাস ছিল। এখন ভারত একজনকে বিশেষ দূত নিয়োগ করে তিব্বতের জন্য এই ঘোষণা করতে পারে যে, যদিও তিব্বতকে এক রাজনৈতিক 'বাফার' হিসেবে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তবুও তিব্বত দু' দেশের মধ্যে এক সেতুর কাজ করতে পারে।

চীনের বর্ধমান চ্যালেঞ্জগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করে আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় ভারতের ভাবনাচিন্তা করা দরকার এবং সক্রিয়ভাবে সৃজনশীল হতে হবে। আমেরিকার TPSA এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিব্বত চীনের 'অ্যাকিলিসের হিল' রয়ে গেছে।

যদি ভারত এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে রাজি না হয় তবে যেটা সবচেয়ে কম করতে পারে তা হলো তিব্বত সম্পর্কে চীনের অবস্থানকে সমর্থন থেকে বিরত থাকা চীনের আক্রমণাত্মক হিমালয়ান অঞ্চলের সংশোধনবাদকে থামাতে এবং উত্তরভারতের বেশিরভাগ জলের জন্য নলের কলের ছিপির নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনাকে চ্যালেঞ্জ করতে সহায়তা করার জন্য এটা প্রয়োজন। সতর্কতার সঙ্গে তার তিব্বত নীতি পুনরায় সংশোধন করে ভারত তিব্বতকে আন্তর্জাতিক কৌশলগত ও পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে উন্নীত করতে সহায়তা করতে পারে।

(লেখক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ)

এখন থেকে 'প্রণব' পত্রিকা অনলাইনেও পাওয়া যাবে—

www.bsspronabpub.com

প্রণব সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করুন—

swamivedanandamaharaj@gmail.com
maharajswaminirmalananda@gmail.com

শোক সংবাদ

সিউড়ী নগরের স্বয়ংসেবক তথা প্রচারক বিশ্বজিৎ দাসের মাতৃদেবী পূর্ণিমা দাস গত ২২ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

****

উত্তরদিনাজপুর জেলা কার্যবাহ তথা হাসুয়া শাখার স্বয়ংসেবক দীপঙ্কর ঘোষের পিতৃদেব প্রশান্ত কুমার ঘোষ গত ৫ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।
Regd. Trade Mark
দুলালের
তালমিছরি
ভারত সরকারের
R
® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

তৃণমূলের ‘জয় বাংলা’ স্লোগান কি গভীর কোনও ষড়যন্ত্রের অঙ্গ?

ড. তরুণ মজুমদার

‘জয় বাংলা’কে বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান হিসেবে ঘোষণা করতে হবে এই মর্মে ২০১৭ সালের শেষ দিকে হাইকোর্টে রিট পিটিশন করেছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বশির আহমেদ। এই রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে ‘জয় বাংলা’ বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান হবে বলে আদেশ দিয়েছে সে দেশের হাইকোর্ট। এ পর্যন্ত খুবই স্বাভাবিক ঘটনা কিন্তু খটকা লাগে যখন দেখি ‘জয় বাংলা’ স্লোগান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের মাত্রাতিরিক্ত মাতামাতি। অদ্ভুতভাবে সময়কালটাও এক্ষেত্রে বেশ লক্ষণীয়। ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বা ২০১১-তে এরাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সময়ও ‘জয় বাংলা’ স্লোগানটি সারফেসে ছিল না। অথচ ২০১৮ সাল থেকেই একটি বিদেশি জাতীয় স্লোগান নিয়ে এরাজ্যের রাজনৈতিক দলের এই বাড়াবাড়ি রকমের আদিখ্যেতা শুধুই কি কাকতালীয়, নাকি কোনো গভীর ষড়যন্ত্রের অংশবিশেষ? তবে হিন্দু হত্যায় মাতোয়ারা নরপিশাচ সোহরাবর্দির ভাবশিষ্য এবং ঢাকার রমনা কালীমন্দির ধ্বংসকারী শেখ মুজিবুর রহমানের সৃষ্ট ‘জয় বাংলা’ স্লোগানকে আপন করে নেওয়ার এই তৃণমূলি সংস্কৃতিকে পশ্চিমবঙ্গের আপামর বাঙ্গালি কি মন থেকে মেনে নিতে পারবেন? প্রশ্নটা ঠিক এখানেই।

বুকে মরু সংস্কৃতি বহন করে মুখে বাংলাভাষায় কথা বললে তাকে কি বাঙ্গালি বলা যায়? কর্মসূত্রে কোনো বাঙ্গালিকে যদি বছরের পর বছর ইংল্যান্ডে থেকে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়, তবে কি সে জাতিতে ইংরেজ হয়ে যায়? শেখালে তোতাপাখিও বাংলাভাষায় কথা বলতে পারে। তবে তাকেও কি বাঙ্গালি বলবো?

বাঙ্গালি মানে বাড়িতে তুলসীতলা থাকবে, সন্ধ্যা আরতি হবে, পয়লা বৈশাখ, ভাইফোঁটা, চড়ক, গাজন, দোল, দুর্গাপূজা থাকবে, কমপক্ষে পাঁচ হাজার বছরের একটি সংস্কৃতি থাকবে। যেখানে এসবের বালাই নেই, তারা বাঙ্গালি হয় কী করে? জলখাবারকে নাস্তা বলে, স্নানকে গোসল বলে, বাংলা শব্দ জলের পরিবর্তে ফার্সি শব্দ পানি ব্যবহার করে তারা কখনও বাঙ্গালি হতে পারে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার ‘নেশন কী’ প্রবন্ধে লিখেছেন ‘বাংলাভাষায় কথা বললেই কেউ বাঙ্গালি হয়ে যায় না।’ শুধুমাত্র ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে একটি জাতি তৈরি হয়— এই প্রচার শুধু ভ্রান্তই নয়, বরং তা আরব সাম্রাজ্যবাদীদের এক কুটিল ষড়যন্ত্র। তাদের সহজাত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের এ হলো প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে বলপূর্বক ভাষার ইসলামিকরণ এবং হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে সাজুয্য রেখে সৃষ্টি হওয়া শব্দগুলির পরিবর্তন। বাবাকে আব্বা, দিদিকে আপা, কাকাকে চাচা, রামধনুকে রংধনু, আকাশিকে আসমানি প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা এখন এই দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলেছি।

পেট্রোডলারের মুখাপেক্ষী কতিপয় ঐতিহাসিকের বিকৃত ন্যারেটিভকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আরব সাম্রাজ্যবাদীদের দালালি করে চলা জয়বাংলা স্লোগানধারী রাজনৈতিক শৃগালদের সামনে সঙ্ঘশক্তিতে আস্থা রেখে প্রতিরোধের শক্ত দেওয়াল গড়ে তোলা ছাড়া আর বাঁচার রাস্তা নেই।

প্রতিটি ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, বাচনভঙ্গি আছে, রীতিনীতি আছে। এক ভাষার গতিপ্রকৃতির সঙ্গে অপর ভাষার গতিপ্রকৃতির সাদৃশ্য জোর করে খোঁজার এই বিকৃত সেকুলারি প্রচেষ্টা বাস্তবিক অর্থেই ঘৃণার্হ। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন নিয়ে কবিগুরুর অনুধাবন প্রণিধানযোগ্য। কবিগুরুর ভাষায়, ‘আজকের বাংলাভাষা যদি বাঙ্গালি মুসলমানদের ভাব সুস্পষ্টভাবে ও সহজ ভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম হয় তবে তারা বাংলা পরিত্যাগ করে উর্দু গ্রহণ করতে পারেন। ...যেসব ফারসি আরবি শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত অথবা হয়তো কোনো এক শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে।’

বর্তমান পরিস্থিতিতে সাংস্কৃতিক জিহাদের এই অশুভ প্রচেষ্টা এরাজ্যে

BANSIDHAR BADRIDAS MODI PRIVATE LTD

EDEN HOUSE

17/1, LANSDOWNE TERRACE

LANSDOWNE MANOHAR PUKUR CROSSING

KOLKATA - 700026

OWNERS : SREE SIBBARI T.E

HEAD-OFFICE

P.O - DIBRUGARH, ASSAM

With best Compliments from :

তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিনপুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ (৫/৪৬)

BHARAT STEEL INDUSTRIES

190, Girish Ghosh Road, Belurmoth, Howrah

Pin- 711 202

শুধুমাত্র উৎকট ভাবে প্রতীয়মানই হচ্ছে না বরং সমাজ এই জেহাদি বিষবাষ্পে সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে পড়ার মাধ্যমে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে। 'জয় বাংলা' স্লোগানধারী রাজনৈতিক মদতদাতারা সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে ব্রাত্য করে শুধুমাত্র বিকৃত ভাষাভিত্তিক বাঙ্গালি জাতিসত্তাকে সামনে রেখে সুকৌশলে বৃহত্তর বাংলাদেশ গড়ার ষড়যন্ত্রকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। উর্দু ভাষার শিক্ষকের পরিবর্তে বাংলাভাষার শিক্ষক চেয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শামিল হওয়াটাও আজ এ রাজ্যে রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। পুলিশের গুলিতে দাড়িভিটে রাজেশ-তাপসের মর্মান্তিক মৃত্যু কোনো ব্যতিক্রমী বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং তা বৃহত্তর বাংলাদেশ গড়ার উদগ্র বাসনার অঙ্গ। পার্শ্ববর্তী দেশগুলি থেকে ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত, নিপীড়িত, ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে আসা হিন্দু মা-বোন-ভাইদের এদেশে সম্মান নিয়ে বাঁচার সুযোগ করে দেওয়ার মহতী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সম্পূর্ণ মানবিকতার খাতিরে যখন ভারত সরকার সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়ন করে, তখন তার বিরোধিতার নামে এরাজ্যে রাজনৈতিক মদতে রাজপথে শ'য়ে শ'য়ে বাস, টোল প্লাজা, ট্রেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার প্রকাশ্য তাণ্ডব চলতে থাকে। ভারত সরকারের এই শুভ উদ্যোগকে বানচাল করার তাগিদে এরাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ইউনাইটেড নেশনস্-এর তত্ত্বাবধানে গণভোটের দাবি করে বসেন! নেপথ্যে কি শুধুই রাজনৈতিক বিরোধিতা? নাকি বৃহত্তর কোনো ষড়যন্ত্র?

ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়া ১০ জন আলকায়দা জঙ্গিকে সংবিধানের শপথ নিয়ে আসনে বসা তৃমমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী কীভাবে আগ বাড়িয়ে নির্দোষ ঘোষণা করতে পারেন! কীভাবেই বা প্রেস মিডিয়ার সম্মুখে এই জঙ্গিদের মুক্তির দাবি করেন!

রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন বাঙ্গালি সমাজ যদি আরব সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল এই জেহাদি রাজনৈতিক শক্তির সামনে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে তাহলে অচিরেই আমরা এই ষড়যন্ত্রমূলক আগ্রাসনের তৃতীয় তথা শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করব। বাঙ্গালি জাতিসত্তার জবরদখল তখন শুধু সময়ের অপেক্ষা হয়ে দাঁড়াবে। সারাবিশ্ব তখন বাঙ্গালি বলতে মুসলমান বাঙ্গালিকেই বুঝবে। লেখাটির এই সন্ধিক্ষণে এসে হয়তো অনেকেরই ভ্রূ কুঁচকে উঠবে, হয়তো-বা অনেকেই সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজে পাবেন। কিন্তু একেবারে বাড়ির পাশে ঘটে চলা একটি বাস্তব ঘটনার উদাহরণ টানলে এই আশঙ্কা যে অমূলক নয় সে বিষয়ে বাস্তবিকভাবেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

রোহিঙ্গাদের সম্বন্ধে একটু পড়াশোনা থাকলেই এব্যাপারে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। রোহিঙ্গা বলতে আমরা প্রায় সকলেই মুসলমান রোহিঙ্গা বুঝি। জানিই না যে রোহিঙ্গা একটি জাতিগোষ্ঠী, কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী নয়। একেবারে গোড়ার দিকে সকল রোহিঙ্গাই বহুত্ববাদী হিন্দু অর্থাৎ পলিথেইস্ট ছিলেন। ভীষণভাবে পৌত্তলিক ছিলেন। অন্য জনগোষ্ঠী, দেশ, এলাকা ইত্যাদিতে যেভাবে ইসলামি আরব্য সংস্কৃতির আগ্রাসনে ধর্মান্তরকরণ হয়েছে, তাতে রোহিঙ্গারাও বাদ যায়নি, সঙ্গে ব্যাপক হারে বংশবৃদ্ধি। আর, বেচারা হিন্দু রোহিঙ্গারা মাইনরিটি হতে হতে মাত্র কয়েক হাজারে পর্যবসিত হলো। ধীরে ধীরে হিন্দু রোহিঙ্গাদের অস্তিত্ব ম্রিয়মাণ হতে লাগলো এবং রোহিঙ্গা বলতে শুধুমাত্র মুসলমান রোহিঙ্গারাই বিশ্বে পরিচিতি লাভ করলো। এখনও সামান্য কিছু হিন্দু রোহিঙ্গা পরিবারের দেখা মেলে বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে। এরা মায়ানমার সেনার মার খেয়ে পালিয়ে আসেননি, পালাতে বাধ্য হয়েছেন মুসলমান রোহিঙ্গাদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি' ও তাদের ভায়রা- ভাইদের অত্যাচারে। বহু হিন্দু রোহিঙ্গাকে গণহত্যা করা হয়, মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়। বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরেও ওদের উপর অত্যাচার অব্যাহত। হিন্দু রোহিঙ্গাদের তাই পৃথক শিবিরে রাখা হয়েছে। ওই শিবিরেও মহিলাদের ভয়ে ভয়ে সিঁদুর পড়তে হয়, অনেকে ঝামেলা বাড়ার ভয়ে সিঁদুর পরেনই না। হিন্দু রোহিঙ্গারা নিজেদের অস্তিত্বের লড়াই সমবেতভাবে না লড়তে পারার জন্যই রোহিঙ্গা মানে এখন যেমন মূলত শুধুই মুসলমানদের বোঝায়, তেমনি একদিন হয়তো, কিংবা অবশ্যম্ভাবী যে বাঙ্গালি বলতেও কেবলমাত্র মুসলমান বাঙ্গালিকেই বোঝাবে।

বাংলাদেশ থেকে অকথ্য অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে যে অভাগা হিন্দু মা-বোন-ভায়েরা পৈতৃক ভিটেমাটি ছেড়ে এদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন বা আজও হচ্ছেন, তারা তো বাংলাতেই কথা বলেন। তারাও তো বাঙ্গালি, তবুও তারা বিতাড়িত? কিন্তু কেন? পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত সুশীল সমাজ এই প্রশ্নের উত্তরে আর কতদিন নিশ্চুপ থাকবেন! আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত শ্রীকান্ত উপন্যাসে লিখে গেছেন, 'ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালি ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ।' শরৎচন্দ্র বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরে কলমের মাধ্যমে প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ জ্বেলেছিলেন। কথাশিল্পীর এই আত্মোপলব্ধি আমাদের অবচেতনে সুপ্ত করে রাখলে চলবে না, তাকে অবচেতনের অন্ধকার থেকে চেতনের আলোয় আনতেই হবে। পেট্রোডলারের মুখাপেক্ষী কতিপয় ঐতিহাসিকের বিকৃত ন্যারেটিভকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আরব সাম্রাজ্যবাদীদের দালালি করে চলা জয়বাংলা স্লোগানধারী রাজনৈতিক শৃগালদের সামনে সঙ্ঘশক্তিতে আস্থা রেখে প্রতিরোধের শক্ত দেওয়াল গড়ে তোলা ছাড়া আর বাঁচার রাস্তা নেই। কৃষ্টি ও ঐতিহ্যে ঋদ্ধ পশ্চিমবঙ্গকে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের কাছে মাথা উঁচু রেখে বেঁচে থাকার মতো বাসযোগ্য করে যেতে চাইলে স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের আদর্শকে পাথেয় করে সঙ্ঘশক্তিতে আত্মনিবেদিত হতেই হবে, নতুবা অচিরেই সর্বনাশ। ■

রাজ্য শাসনে রাজ্যপালের সক্রিয়তা সংবিধানসম্মত

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি ইত্যাদি রাজ্যে সম্প্রতি রাজ্যপাল ও ক্যাবিনেটের মধ্যে বেশ বিরোধ ও তিক্ততার কারণে রাজনৈতিক জটিলতা দেখা দিয়েছে। সেই জন্যই মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা ও ক্ষমতা নিয়ে একটু আলোচনা হওয়া দরকার।

প্রসঙ্গগুলি নিম্নলিখিত দিকগুলো নিয়ে আলোচিত হওয়া উচিত :

(১) মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল, (২) মুখ্যমন্ত্রী ও ক্যাবিনেট, (৩) মুখ্যমন্ত্রী ও বিধানসভা, (৪) মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল, এবং (৫) মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যবাসী।

প্রথমত, বিখ্যাত আইনজীবী জি.এন. যোশী মন্তব্য করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যের 'de facto head' বা প্রকৃত শাসক— (The constitution of India, পৃ. ১৯১)। তার অর্থ হলো— যদিও সংবিধান রাজ্যপালকে রাজ্যের শাসনপ্রধান বলে চিহ্নিত করেছে, মুখ্যমন্ত্রী আসলে 'de jure head' বা নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। ১৫৪ (১) নং অনুচ্ছেদ রাজ্যপালকে রাজ্য শাসনের অধিকার দিলেও আমরা ব্রিটেনের মতো ক্যাবিনেট ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি বলে তাঁকে অনেকটা নেপথ্যে থাকতে হয়— শাসন চালায় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন ক্যাবিনেট।

তবে ১৬৩ (১) নং অনুচ্ছেদ জানিয়েছে যে, ক্যাবিনেটের কাজ হলো 'to aid and advise the governor।' কিন্তু কোথাও বলা হয়নি যে, রাজ্যপাল ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুসারে সব ক্ষেত্রে চলতে বাধ্য। আসলে, সব মন্ত্রীই রাজ্যপালের 'sub-ordinate' বা অধীনস্থ ব্যক্তি— তিনি থাকেন শাসনব্যবস্থার শীর্ষে।

তাছাড়া সংবিধানের ১৬৩ (১) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে তিনি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং যেসব ব্যাপারে তিনি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করবেন না, সেই সব জায়গাতেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে পরামর্শ দিতে পারেন। এটা লক্ষণীয় যে, ১৬৩ (২) নং অনুচ্ছেদ জানিয়েছে তিনিই ঠিক করবেন কোনগুলো তাঁর এই ক্ষমতার আওতায় পড়ে

রাজপাল আদৌ নিষ্ক্রিয় শাসক নন— মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে কলের পুতুল বলতে পারেন না।

এবং এটা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা যায় না। ড. এম. ভি. পাইলী মনে করেন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ওই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন—

(ক) মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ, (খ) মন্ত্রীর পদচ্যুতি, (গ) বিধানসভা আহ্বান ও ভাঙে দেওয়া, (ঘ) অর্ডিন্যান্স জারি করা, (ঙ) মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে তথ্য চাওয়া, (চ) রাজ্য-বিলে ভেটো দেওয়া, এবং (ছ) রাষ্ট্রপতি শাসন জারির জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানানো।

তাঁর মতে, এভাবে তিনি আইন 'vital note' গ্রহণ করতে পারেন, কারণ তিনি 'mere figurehead — (An Introdction to the constitution of India, পৃ. ২২৪-৫)। অবশ্য দুর্গাদাস বসু মনে করেন, এই ক্ষমতা আরও অনেক বিস্তৃত হতে পারে— সেটা নির্ভর করে 'according to circumstances'— (Introduction to the constitution of India)।

আরও বড়ো কথা হলো— ১৫৯ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে তিনি যে শপথ নেন, তাতে ঈশ্বরের নামে বা বিবেকের দোহাই দিয়ে বলতে হয় তিনি সংবিধান ও আইনকে রক্ষা করবেন— (preserve, protect and defend the constitution and the law'), এবং রাজ্যবাসীর কল্যাণের ('well being') জন্য সচেষ্ট থাকবেন। সুতরাং তাঁর দায় সংবিধান, আইন ও রাজ্যবাসীর কাছে। তাই যদি তাঁর মনে হয়— মুখ্যমন্ত্রীর কোনও পরামর্শ এগুলোর পরিপন্থী, তাহলে তিনি ভিন্নধর্মী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলতেই পারেন। এই কারণে ড. এস. সি. কাশ্যপ মন্তব্য করেছেন, 'There are certain measures where the governor may have to use his own wisdom and discretion– (Our Constitution, পৃ. ২১৪)।

আসলে কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা গৃহীত হলেও একটু পার্থক্য আছে। মরিস জোন্সের মতে, সংবিধান-রচয়িতারা দেশের ঐক্য ('organic unity') রক্ষা করার জন্য রাজ্যপালকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন, কোনও রাজ্য-সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙতে চাইলে রাজ্যপালের মাধ্যমে কেন্দ্র সেটা রোধ করতে পারেন (Government and Politics, পৃ. ৮০)। কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ ঘটলে তাই রাজ্যপালকে কেন্দ্রের দিকে থাকতে হয়, নতুবা তাঁর পদচ্যুতি ঘটতে পারে (১৫৬ নং অনুচ্ছেদ)।

এই সব কারণে বলা যায়, রাজপাল আদৌ নিষ্ক্রিয় শাসক নন— মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে কলের পুতুল বলতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ক্যাবিনেটের প্রধান। রাজ্যপাল তাঁর দেওয়া তালিকা অনুসারেই অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন এবং যে কোনও সময় তাতে অদলবদল ঘটাতে পারেন। অবশ্য অনেক সময় তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দলের কোনো কোনো অপছন্দের ব্যক্তিকেও ক্যাবিনেটে নিতে হয়। ড. বি.সি. রাউতের ভাষায়— 'Of course, the Chief Minister cannot ignore some important members in the party–(Democratic Constitution of India, পৃ. ২২৬)। কোনও মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটলে উক্ত

ব্যক্তি সরে যান— অন্যথায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে বিতাড়িত করতে পারেন। তবে অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে রেখে দিতে হয় দলের চাপে।

তবে স্বাভাবিক অবস্থায় তিনিই ক্যাবিনেটের প্রাণপুরুষ। ড. এস.এল. সিক্রি জানিয়েছেন, 'He is expected to co-ordinate guide, control and direct the activities of the Ministers'– (Indian Government and Politics, পৃ. ২২৬)। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না— বিশেষ করে, যদি কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রী একত্রিত হন, তবে তাঁকে সংযত থাকতেই হবে।

তৃতীয়ত, তিনি বিধানসভায় সরকারের মুখ্য প্রতিনিধি। ড. হরিহর দাস লিখেছেন, 'He (or she) expounds the policy of the government in the Legislature Assembly and is regarded as the chief spokesman (or spkesperson) of the government'– (Principles of Indian Constitution, পৃ. ১৭১)।

তাঁর বক্তব্যকেই সরকারের নীতি হিসেবে গণ্য করা হয়। বিধানসভায় কোনও মন্ত্রী বিরোধীদের সমালোচনায় বিব্রত বোধ করলে তিনিই তাঁর সমর্থনে উঠে দাঁড়ান।

চতুর্থত, তিনি তাঁর দলেরও অন্যতম প্রধান নেতা। এই কারণে তাঁকে দলীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে হয়। তাঁর ক্ষমতা মূলত নির্ভর করে দলীয় সমর্থনের ('party backing') ওপর। দলের সভাপতি ও অন্যান্য প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা না থাকলে বিধানসভায় তাঁর গরিষ্ঠতা থাকে না— সেক্ষেত্রে তাঁকে বিদায় নিতে হয়। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ দলীয় ভাঙনের ফলে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সুতরাং, তাঁকে একনায়ক বলা চলে না। অত্যন্ত সংযত ও সতর্ক ভাবে তাঁকে চলতে হয়— দলের ভেতরে ও বাইরে তাঁকে মাঝে মাঝে সমঝোতাও করতে হয়, বিরোধী দলের সঙ্গেও যথাসাধ্য সুসম্পর্ক রাখতে হয়।

পঞ্চমত, তবে অনেক কিছু নির্ভর করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের ওপর। একজন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, প্রভাবশালী ও সুদক্ষ ব্যক্তি এই পদে বসলে তিনি রাজ্যবাসীকে প্রভাবিত করতে পারেন এবং তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা থাকলে তিনি তাঁর অনুগত জনগণের ভরসাতেই বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, তখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না। বিধানচন্দ্র রায় বা মোরারজী দেশাই যেখানে পৌঁছেছেন, সেখানে যাবার কথা রাবড়ি দেবী বা অজয় মুখার্জি ভাবতেই পারেন না।

তবে আরও বড়ো কথা হলো রাজনৈতিক পরিস্থিতি। মুখ্যমন্ত্রীর দলই কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকলে ও তিনি নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় বসলে তিনিই হয়ে ওঠেন সর্বেসর্বা। যদি কেন্দ্রে অন্য দল ক্ষমতাসীন হয়, তাহলে তাঁকে সংযত হতেই হবে। আর যদি কেন্দ্রে অনেকগুলি দলের জোট ক্ষমতায় বসে আর তিনি যদি সেই কোয়ালিশনের প্রধান হন, তবে তাঁর সামনে সংকট দেখা দিতে পারে। এই কারণে ড. জে.সি. জোহারী এই তিন ধরনের মুখ্যমন্ত্রীকে যথাক্রমে 'Showsman', 'Spokeman', ও 'Postman' মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন— (Indian Constitution, পৃ. ৩৬৭)।

সব দিক বিচার করে বলা চলে— সংবিধান সব কিছু নির্ধারণ করতে পারে না, অনেক অলিখিত বিষয় এতে জড়িয়ে আছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ছিল অনুপম ব্যক্তিত্ব, পেছনে ছিল দলের একক প্রাধান্য, রাজ্যপাল ছিলেন ড. হরেন্দ্র মুখার্জি ও পরে পদ্মজা নাইডুর মতো নিরাসক্ত মানুষ এবং কেন্দ্রে ছিল তারই দল। কিন্তু মুলায়ম সিংহ, রাবড়ি দেবী, লালুপ্রসাদ প্রমুখের ক্ষেত্রে অবস্থা হয়েছে একেবারে ভিন্নধর্মী। হরিয়ানায় চৌতালাকে তাঁর পিতা ওই পদে বসিয়েছেন— দলীয় গণ্ডগোলের ভয়ে শপথ নিতে হয়েছেন দিল্লিতে। ওড়িশায় একটা সময় ষোলো মাসে ষোলোটা সরকারের উত্থান-পতন ঘটেছিল, মুখ্যমন্ত্রীরা ছিলেন ক্ষণস্থায়ী।

অথচ, কোনো কোনো মুখ্যমন্ত্রী 'national leader'-এর মর্যাদা পেয়েছেন— (মধুমঙ্গল সিংহ, The Constitution of India, পৃ. ৮১৭)। আবার কেউ কেউ হারিয়ে গিয়েছেন স্মৃতির অতলে। বিশেষ করে ১৯৬৭ সালের পর কংগ্রেসের ভগ্নদশা ঘটায় বহুদলীয় অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে, রাজ্যে রাজ্যে কোয়ালিশন সরকার গড়তে হয়েছে ও আগমন-নির্গমন ঘটেছে বহু অসহায় মুখ্যমন্ত্রীর। তাছাড়া ইন্দিরা গান্ধীর সুবর্ণ সময়ে বহু মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় এসেছেন তাঁর অনুগ্রহে। এতে পদটার অবমূল্যায়ন হয়েছে— জে.এ.সি. কাপুর— দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃ. ৩৭৪)। তাই এক কথায় পদটার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন ব্যাপার।

(লেখক নিউ আলিপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

করোনা মহামারীর কারণে আমরা দীর্ঘদিন স্বস্তিকার মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করতে পারিনি। কিন্তু অনলাইনে স্বস্তিকার ওয়েবসাইট সংখ্যা যথাসম্ভব নিয়মিত স্বস্তিকার পাঠক /গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ওয়েবসাইট সংখ্যা প্রকাশের জন্য স্বস্তিকা দপ্তর সচল রাখার ব্যয়ভারও স্বস্তিকা বহন করেছে। এমতাবস্থায় বর্তমানে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো স্বস্তিকারও আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়।

তাই স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি ও বার্ষিক গ্রাহকদের কাছে বিশেষ আবেদন, যাঁদের গ্রাহক মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁরা সত্বর গ্রাহকমূল্য (৫০০ টাকা) পাঠিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করুন। কারণ, এই করুণ আর্থিক সঙ্গতিতে ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে বকেয়া গ্রাহকদের স্বস্তিকা পাঠিয়ে যাওয়া আমাদের সামর্থ্যের বাইরে।

আশারাখি, আমাদের অসহায় অবস্থার কথা অনুভব করে স্বস্তিকার প্রকাশনা সচল রাখতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

সারদা প্রসাদ পাল
প্রকাশক, স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

রাজ্য বিজেপির সভাপতিকে আটকানোর চেষ্টা (ফাইল চিত্র)।

পশ্চিমবঙ্গে শাসকের নিরপেক্ষতা ডুমুরের ফুল

তথাগত রায়

১৯৯১ সালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র উঠে যাবার পরে অনেকের ধারণা হয়েছিল পৃথিবী বোধ হয় এবার গণতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছে। যদিও এর মাত্র দুবছর আগে চীনে তিয়েনআনমেন স্কোয়ারের গণহত্যা হয়েছিল, তবু চীন অর্থনৈতিক ভাবে উদারতন্ত্রের পথে চলায় মনে হয়েছিল এর সঙ্গে একনায়কতন্ত্রের কোনো সামঞ্জস্য হতে পারে না, অতএব ভুল করলেও শেষপর্যন্ত চীনও গণতন্ত্রকে আশ্রয় করবে। কিন্তু তারপর আরও তিন দশক কেটে যাবার পর মনে হচ্ছে এত আশা করার পরিস্থিতি বোধ হয় এখনো আসেনি।

কিন্তু গণতন্ত্র ব্যাপারটা কী, এ সম্বন্ধে একটু ধারণা পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। তার কারণ পৃথিবীর সম্ভবত সবচেয়ে স্বৈরাচারী,সবচেয়ে একনায়কতন্ত্রী দেশ উত্তর কোরিয়ারও পোশাকি নাম 'গণতান্ত্রিক কোরিয়ার জনগণের সাধারণতন্ত্র' (Democratic Peoples' Republic of Korea)। আমাদের হিসাবে আমরা গণতন্ত্র তাকেই বলি যেখানে একাধিক রাজনৈতিক দল সরকারে আসার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, সরকারে এলে নিজেদের নীতি অনুযায়ী সরকার চালাতে পারে এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে বিনা প্রতিবাদে সরকার ছেড়ে দেয়। শুধু তাই নয়, কোনো সরকারের শাসন চলাকালীন সাধারণ মানুষ সরকারের সমালোচনা বলতে পারে, অবশ্যই কিছু নিয়মনীতি বা বিধিনিষেধের মধ্যে।

এই নীতিতে, পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা খুব বেশি নয়। বিশেষ করে যে সব দেশ নিজেদের ফলাও করে গণতন্ত্র বলে জাহির করে তারা অনেক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র নয়— যেমন চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভৃতি। যেসব দেশে নির্বাচন প্রক্রিয়া আছে কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরেও সরকারকে কোনো দৃশ্য বা অদৃশ্য শক্তির কথা শুনে চলতে হয় (সাধারণত সেনাবাহিনী) সেগুলোও গণতন্ত্র নয়। এই ব্যাপারটা আছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান ও মিয়ানমারে।

গণতন্ত্রের আর একটি লক্ষণ সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা। বস্তুত সংবাদমাধ্যমকে বলা হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমাদের ভারত এই সব নিরিখে এখনো পুরোপুরি গণতান্ত্রিক।

ভারতে গণতন্ত্রের এইসব লক্ষণের থেকে যে কখনো বিচ্যুতি হয়নি তা নয়। বিচ্যুতি পোশাকিভাবে (formally) হয়েছে, ১৯৭৫-৭৭-র তথাকথিত জরুরি অবস্থার সময়। অ-পোশাকিভাবেও (informally) হয়েছে, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে এবং দেশের আরও দু-একটি অঞ্চলে। এই দ্বিতীয় ধরনের বিচ্যুতিটা বেশ মারাত্মক, কারণ বাইরের লোক অনেক সময়েই এর স্বরূপ বুঝতে পারে না, মনে করে দেশে গণতন্ত্র বজায় আছে। এই ধরনের বিচ্যুতি হয়েছে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেই, ১৯৬৭ সালের পরে ছাড়াছাড়া ভাবে এবং ১৯৭৭-এর পরে আজ পর্যন্ত একেবারে অবিচ্ছিন্নভাবে। আমাদের এই নিবন্ধে এই দ্বিতীয় ধরনের বিচ্যুতি সম্বন্ধে বিশেষ করে আলোচনা হবে, কারণ, আমরা এই পশ্চিমবঙ্গেই বাস করি।

এই দ্বিতীয় ধরনের বিচ্যুতি সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে

দু'ধরনের মানুষ থাকে। প্রথম ধরনের মানুষ রাজনৈতিক। এঁরা জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত হন এবং এঁরা কেন্দ্রের বা রাজ্যের শাসনযন্ত্রের একেবারে শীর্ষে থাকেন। অন্য ধরনের মানুষ হচ্ছেন তাঁরা, যাঁদের সাধারণভাবে আমলা বলা হয়। এঁরা শাসনযন্ত্রের শীর্ষের ঠিক নীচের স্তর থেকে একেবারে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত থাকেন। এঁদের কাজ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত কাজে রূপায়ণ করা। এঁরা একেবারে অরাজনৈতিক এবং গণতন্ত্রের অন্যতম শর্তই হচ্ছে এঁরা কদাচ রাজনীতিতে জড়াবেন না, অরাজনৈতিকই থাকবেন। যে দ্বিতীয় ধরনের বিচ্যুতির কথা আগে বলা হয়েছে তা সাধারণত এই শর্ত ভঙ্গ করা নিয়েই।

পশ্চিমবঙ্গে এই বিচ্যুতি আরম্ভ হয় ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এবং তার পরের পাঁচ বছরের নৈরাজ্যে। তার পরের পাঁচ বছর, অর্থাৎ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালীন এই বিচ্যুতি বিচ্ছিন্নভাবে চলেছিল। এই সময়েই পুলিশ-প্রশাসনের রাজনীতিকরণ আরম্ভ হয় এবং এর মধ্যে বর্ধমানের সাঁইবাড়ির হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা হয়, যাতে পুলিশ কার্যত বোবা হয়ে ছিল।

কিন্তু ১৯৭৭ সালে, অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই প্রক্রিয়ার যোলোকলা পূর্ণ হয়। প্রখ্যাত সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত সেই সময়কার ব্যাপারে লিখেছিলেন, ডি-এম বা এস-পি নিযুক্তির সময়ে জ্যোতিবাবু জিজ্ঞাসা করতেন, 'আমাদের কথা শুনবে-টুনবে তো'? অর্থাৎ ডি-এম বা এস-পি সাহেব রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কাজ করবেন কি না?

কালক্রমে তাঁরা এই রকমভাবে কাজ করতেই অভ্যস্ত হয়ে যান এবং এটাকেই স্বাভাবিক বলে মানুষ মনে করতে শুরু করেন। সামান্য কয়েকজন আমলা যাঁরা বেগড়বাই করার সাহস রাখতেন তাঁদের কম গুরুত্বপূর্ণ পদে বা কেন্দ্রীয় সরকারে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা যেতে পারে পুলিশ-প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করা। তৃণমূল আমলে এই ব্যবস্থা পূর্ণতা পেয়েছে। কারণ মমতা ব্যানার্জি হচ্ছেন সিপিএমের গুরুমারা চেলা। তাঁর আমলে এঁদের পাঠানো হয় 'কম্পালসারি ওয়েটিং'-এ। অর্থাৎ আমলা মাইনে পাবেন, কিন্তু তাঁর কোনো কাজ থাকবে না, বসবার জায়গাও থাকবে না, গাড়িও থাকবে না। কর্মদক্ষ আমলার পক্ষে এটা চাকরি যাওয়ার চেয়েও খারাপ।

ব্যবস্থা ভালো, অব্যবস্থা খারাপ। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ এরকম কুব্যবস্থা। আরো খারাপ যখন এটাকেই স্বাভাবিক বলে মানুষ মনে করতে শুরু করেন। এটাই আজকে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের সংকট।

এবার আলোচনা শুরু সিপিএম ও তাদের গুরুমারা চেলা মমতার কিছু কীর্তি নিয়ে। এগুলোর কথা পাঠক জানেন। কিন্তু পিছনে তাকিয়ে এগুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলে বিচ্যুতির স্বরূপ ও পরিমাণটা বোঝা সহজ হবে।

শাসক দলের পতাকা নিয়ে গাড়িতে আক্রমণের চেষ্টা (ফাইল চিত্র)।

উদাহরণ প্রচুর আছে, মাত্র কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল শহর কলকাতার বুকে বালিগঞ্জ স্টেশন সংলগ্ন ওভারব্রিজের উপর দিয়ে দু-তিনটি ট্যাক্সি করে ষোলোজন আনন্দমার্গী সাধু ও একজন সন্ন্যাসিনী যাচ্ছিলেন। দিনে-দুপুরে একটি বিশাল দল এসে ট্যাক্সি থামায় ও আনন্দমার্গীদের টেনে নানিয়ে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে তাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে। এদের নেতৃত্ব দিয়েছিল স্থানীয় এমএলএ এবং একজন তাবড় মন্ত্রী। এই হত্যাকারীদের শাস্তি দূরস্থান, কেউ গ্রেপ্তার পর্যন্ত হয়নি। এই প্রক্রিয়া চলেছে বিরাটিতে, বানতলায়, ছোটো আঙারিয়ায়, নন্দীগ্রামে, নেতাইতে। বরঞ্চ বানতলার বীভৎসতা ঘটনার পরে জ্যোতিবাবু তাচ্ছিল্যভরে বলেছিলেন, 'এমন তো কতই হয়'! এক সাহসী পুলিশ অফিসার তিলজলা থানার ওসি গঙ্গাধর ভট্টাচার্যকে থানার মধ্যেই প্রকাশ্যে গুলি করে মেরেছিল দুই কমরেড। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি, কারুর শাস্তি হয়নি।

তারপর মেধাবী ছাত্রীর দল তৃণমূলের রাজত্ব এল। ২০১৬ সালের নির্বাচনে এরা জেতার ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিন্ত ছিল বলে বেশি গুন্ডামি করেনি। কিন্তু ২০২১ সালের যুদ্ধ মারাত্মক হতে পারে বলে ২০২০ সালের শুরু থেকে এরা আরম্ভ করে দিয়েছে। এর প্রথম বলি উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদের বিজেপি এমএলএ দেবেন্দ্রনাথ রায়। তাঁকে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলিরা বলছে উনি নাকি আত্মহত্যা করেছেন। এর পরে একই প্রক্রিয়ায় বিজেপি কর্মী খুন হতে শুরু করে। এখন পর্যন্ত সংখ্যাটা ১৪০-এর কাছাকাছি পৌঁছেছে। একটির ক্ষেত্রেও পুলিশ তৃণমূলের উপর দোষ দেয়নি, যদিও একটি কচি ছেলেও বুঝতে পারে এর পিছনে তৃণমূল না থেকেই পারে না। দলদাসত্বের এমনি মহিমা।

আজকে পশ্চিমবঙ্গে এটাই গণতন্ত্রের সংকট। রাজনৈতিক দল মাঝে মাঝে নষ্টামি করতেই পারে। গণতন্ত্রের আবশ্যিক শর্ত, কোন দল ক্ষমতায় আছে তার দিকে না তাকিয়ে তাদের কঠোর হাতে দমন করা। তার জন্য প্রয়োজন পুলিশ প্রশাসনের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা। আজকের পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বামশাসন ও ১০ বছরের তৃণমূলি শাসনের পরে যার অবস্থা ডুমুরের ফুলের মতো।

(লেখক ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের পূর্বতন রাজ্যপাল)

Rang Rez Sarees

Wholesalers of Fancy Printed
& Embroidered Sarees

45/1, Rafi Ahmed Kidwai Road

(Entrance also from 77/1/A, Park Street)

2nd floor, Kolkata - 700 016

PHONE : 2265-9147, 2265-0772 (Shop),

for Designer Super Net Sarees

JALAN JAN KALYAN TRUST

Flat No. 1A, Paramount Apartments

25, Ballygunge Circular Road

Kolkata - 700 019, TEL : 2475-6524, 2475-7760

Fax : 2475-7619, E. mail : madhuban@salyam.net.in

বঙ্গ সংস্কৃতি ও বহিরাগত প্রেক্ষাপটে নেতাজী সুভাষ

বিশ্ব গৌরবের গৌরবান্বিত গণতন্ত্র ও মানবতার মানসপুত্র আব্রাহাম লিঙ্কনের দাসপ্রথা নিবারণে ছয় লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল তবু তিনি পিছপা হননি। আবার আফ্রিকার মুক্তিসূর্য নেলসন ম্যান্ডেলা অহিংসা আন্দোলনকে সহিংস রূপদান করেছিলেন শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবসান ঘটাতে ও কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি ঘৃণা নিবারণে।

সাম্প্রদায়িক হিংসামুক্ত বিশ্ব মানবের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই ইতিহাস ম্লান হয়ে যেতে পারে না। যারা নেতাজীকে ম্লান করতে চেয়েছিলেন তারা ভারতবাসীকে হিংসার রক্তের খেলা দান করেছেন। জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বে মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা আবাসভূমি হবে, সেটির নাম হবে পাকিস্তান। কিন্তু সব মুসলমানকে পাকিস্তান নিতে পারেনি। নিপীড়িত হিন্দুদের রক্তের প্লাবন ঘটিয়ে দেশভাগ হয়েছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ সত্যটিকে যারা মেনে নিতে পারছে না, তারা শরণার্থী ও বহিরাগত চিনতে পারছে না। তারা সিএএ-এর বিরোধিতা করছে এবং দেশের মানুষকেই বলছে বহিরাগত।

সবচেয়ে বিপদের কারণ হচ্ছে, এরা দেশবাসীদের বিপদ ডেকে আনছে। কারণ কাজের সন্ধানে অন্য রাজ্যে গেলে তাদেরকেও বহিরাগত হিংসার শিকার হতে হবে না কি? শুধু তাই নয় বহিরাগত শব্দটির দ্বারা দেশকে আবার খণ্ডিত করতে চাইছে। তারা অসত্যকে আশ্রয় করছে। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্যামাপ্রসাদ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বঙ্গগৌরব শুধু নয় বিশ্বগৌরবের ব্যক্তিত্বদের শ্রদ্ধা জানাবার যোগ্যতা এদের নেই।

২০২১ সালের আসন্ন নির্বাচনের রাজনৈতিক তরজা বর্তমান বঙ্গবাসীর রাতের ঘুম দিনের বিশ্রাম সবকিছু হরণ করতে উদ্যত। বর্তমান রাজনীতির তরজার বিশেষ বিষয় বহিরাগত বনাম বঙ্গ জাতীয়তাবাদ। এই বহিরাগতরা হলেন রাজ্যের বাইরে থেকে রাজনৈতিক কারণে ভোট প্রচারে আসা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। অনৈতিক আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে বিপক্ষ নেতৃবর্গকে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে অন্য রাজ্যের লোকদেরকে বহিরাগত বলা গণতন্ত্রের পরিপন্থী নয় কি?

পক্ষান্তরে এ রকম কদর্য আক্রমণে বঙ্গবাসী বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে না কি? এ রাজ্যের ৭০ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ভিন রাজ্যে কাজের জন্য রয়েছেন। তাছাড়া চাকুরি ও ব্যবসার ক্ষেত্রেও ভিন রাজ্যে অসংখ্য মানুষ রয়েছেন তাদের 'বহিরাগত' তত্ত্ব কি সুখের হবে? সর্বপরি এই বহিরাগত শব্দটি দেশকে টুকরো টুকরো করার একটি পথ নির্দেশ করছে না কি?

দ্বিতীয় বিষয়টি বহিরাগতরা বঙ্গ সংস্কৃতির কিছুই জানে না। এই বঙ্গ সংস্কৃতির বর্ণনা দিতে গেলে প্রথমেই বঙ্গ সংস্কৃতির পৌরাণিক থেকে বর্তমান মনিষীগণের মাহাত্ম্যপূর্ণ দিক আলোচ্য বিষয়। রাজনৈতিক, কৃষি, শিল্প, সমাজ, সাহিত্য, নৃত্য-গীতি প্রভৃতি সকল বিষয়গুলো আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

তথাকথিত ঐতিহাসিকরা আর্যদের বহিরাগত বলেছেন আবার ভারতীয় ঐতিহাসিকরা রাখালদাস ও ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, আর্যরা বহিরাগত নয়। তারা ভারতেরই। সেই আর্যদের একটি অংশ আমরা বাঙ্গালিদের আমাদের সমাজব্যবস্থায় গ্লানিমোচনে হিন্দু ধর্মে মনিষীদের আত্মত্যাগ উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের অবদান বিশ্ব বিদিত। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বিশ্ব ধর্মসভায় কলম্বাস হলে শিকাগো শহরে ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন— কোনো ধর্মই ছোটো বা বড়ো নয় সকল ধর্মই সমান। তিনি ভারতের অহিংস ত্যাগের মাহাত্ম্য উচ্চে তুলে ধরেছেন এবং বিশ্ববাসীকে আপন করে নিয়েছেন। কিন্তু আজ পশ্চিমবঙ্গে সরকার ভারতবাসীকে বহিরাগত বলে বাঙ্গালিদের লজ্জিত করছে নাকি? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কার্জনের বঙ্গভঙ্গদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে— বাংলার মাটি বাংলার জল কবিতাটি লিখে ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে নাইট উপাধি পরিত্যাগ করে দেশপ্রেম ও দেশবাসীকে একসূত্রে বাধার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার তুলনা মেলা ভার। কিন্তু রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথকে বসন্ত বরণ উৎসবে তার অসম্মান ও অমর্যাদা যেভাবে প্রদর্শন করছেন তা বঙ্গবাসীর লজ্জা নয় কি?

দেশভাগের সময় ড. শ্যামাপ্রসাদের পশ্চিমবঙ্গকে ভারতভুক্তিকরা এবং কলকাতায় গ্রেট কিলিংসে দুর্গত মানুষের সেবায় বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স দল গঠন করে দেশপ্রেমের নিদর্শন রাখেন ও কাশ্মীরে এক দেশ, এক প্রধান, এক নিশান দাবিতে এবং প্রতিষ্ঠাকল্পে আত্মোৎসর্গ করেন। কিন্তু আজও তার মৃত্যু রহস্যের সঠিক কোনো প্রমাণ আজও প্রকাশ করেননি। এই আত্মত্যাগের মহান ব্যক্তিত্বকে সম্মান প্রদর্শন করা হয় না। অনেক সময় তাকে নানাভাবে কালিমা লিপ্ত করা হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জনসঙ্ঘ তথা আজকের বিজেপিকে বহিরাগত দল বলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
সাহেবের হাট, কোচবিহার।

মালদায় ব্যতিক্রমী কালী পূজা

কয়েকদিন আগে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম এক অদ্ভুত মা কালীর দর্শন করতে। আসলে অন্যান্য অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজার কথা শুনলেও অবাক হয়েছিলাম পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত এই কালীপুজোর কথা শুনে। প্রতিবছর পৌষ মাসের পূর্মিমা তিথিতে মালদহের মাধব

SANHIT POLYMER

Sriniketan Road, Bolpur, Birbhum, West Bengal - 731204
Phone : +91+3463-255-560 / 257-769, E-mail : sanhitpolymer@yahoo.co.in
Fax :+91-3463-254215

Factory : Shibtala-Surul Road, Bolpur, Dist. : Birbhum, West Bangal 731204, Phone : +91+3463-234517 / 645017 / 09732024706

APPLICATION

Industry & Packaging

PP - Icecream cup & Cotainer
HDPE LLDPE Tarpaulim
Pond Liner
Pole (Concrite)
Green House
Geomembrane
LDPE Film/Sheet

Civil & Construction:

Construction Film for concrete
Separation membrane for Road Construction
Liner for Hazards West Pond
Liner for Water Reservoir
Disposal Glass & Cup

With Best Compliments From :-

MUKHERJEE ENGINEERING CO.

Manufacturer of

R. C. C. SPUN PIPES, COLLARS & ALLIED ITEMS

Head Office & Workshop

Sriniketan Road, Bolpur, Pin - 731 204

Phone : (03463) 254-215 (O), Mobile : 9434009737, 919434762433
E-mail : mukherjeeengineeringco@yahoo.com Fax : 03463-254215

নগরের নিমতলায় অনুষ্ঠিত হয় বাউল পরিবারের শ্যামাকালী পুজো। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বাউল পরিবারের অন্যতম সদস্য মহাদেব বাউলের মুখে শোনা গেল এই শ্যামাকালী পুজোর রহস্য। তিনি আমাদের জানালেন প্রায় ৩০০ বছর আগে বাংলাদেশের ঢাকায় তাঁদেরই পূর্বপুরুষ সনাতন বাউল দাস প্রথম স্বপ্নাদেশে এই কন্যারূপের মা-কালীর দর্শন পান। তিনি কন্যারূপী সেই মা-কালীর চরণে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। তাই সেখানে গিয়ে দেখা গেল, মা-কালীর চরণের তলায় ভগবান শিবের পরিবর্তে একজন মানুষ রয়েছেন, সেই মানুষটি হলেন সনাতন দাস বাউল।

শুধু এটাই নয়, আরও দেখে অবাক হতে হয়ে যে, মায়ের গলায় কোনো নরমুণ্ডের মালা নয়, শুধু জবা ফুলের মালা। মায়ের রুদ্র রূপের বদলে এখানে শান্ত রূপ। বৈষ্ণব মতে এখানে মায়ের পুজো হয়। এখানে যজ্ঞ হয় না, পঞ্চকর্ম হয় না। কোনো খিচুড়ি বা অন্নভোগ দেওয়া হয় না। ভোগ হিসাবে ফলমূল ও মণ্ডা, মিঠাই দেওয়া হয়। পূজার ঘট স্থাপন করে এখানে মায়ের পুজো করা হয়। সাধারণত মা-কালীর রুদ্র রূপে খোলা চুল দেখা গেলেও এখানে মায়ের চুলে খোঁপা বাঁধা। অন্যান্য জায়গার মতো তাই এখানে কোনোরকম পশুবলির প্রচলন নেই। মূল মন্দিরে আলাদা ভাবে পুজো হলেও (যদিও সেখানে কোনো মায়ের মূর্তি নেই), এই সময় পাঠকাঠির তৈরি ঘরে মা-কালীকে ছ'মাস ধরে রেখে নিয়মিত পুজো করা হয়। যাদের মানত থাকে, তারা আবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লা কালীর মতো একাধিক মা-কালীর মূর্তি মানত করে ও সেই অনুযায়ী আলাদা মূর্তি তৈরি করে পুজো করা হয়।

—নারায়ণ মণ্ডল,
গৌড় রোড, মালদহ।

রামমন্দির নির্মাণ শুধু সময়ের অপেক্ষা

মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভারতআত্মার সর্বোচ্চ জ্বাললামান প্রতীক তথা মূর্তিমান স্বরূপ। বিদেশি আক্রমণকারীরা তাঁর জন্মস্থানে নির্মিত মন্দিরকে ভেঙে বিজাতীয় উপাসনা স্থান বানিয়ে এদেশের পুত্ররূপ হিন্দুসমাজের সাত্ত্বিক পবিত্র মনোভাবনাকে পদদলিত করার ঘৃণ্য প্রয়াস দীর্ঘকাল চালিয়ে এসেছে। কিন্তু রামভক্ত আপামর ভারতবাসী মন্দির পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা থেকে কোনোদিন একচুলও সরে আসেনি। আইন আদালত থেকে অহিংস সত্যাগ্রহ— সবরকম পথেই লড়াই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চালিয়ে এসেছে। ফলে ৪৯২ বছরের সংঘর্ষ এবং চার লক্ষাধিক রামভক্তের বলিদান ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক রক্তাক্ত অধ্যায় রচনা করেছে। এই রামভক্তদের রক্তে দেশি-বিদেশি শাসকদের হাত রক্তরঞ্জিত। প্রথমে শ্রীরামমন্দিরের তালা খোলার জন্য আন্দোলন। তিন বছরের মাথায় ১৯৮৬ সালে আদালতের রায়ে তালা খোলা হয়েছিল। তারপর মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৮৯-এর কুম্ভমেলায় ধর্মাত্মা ও আধ্যাত্মিক সন্তশক্তি সেই বছর ৯ নভেম্বর শিলান্যাস করার দিনক্ষণ ঘোষণা করে দেন।

তীব্র বিরোধিতা শুরু হয়, রাজনৈতিক পাশাখেলা শুরু হয়ে যায় সংখ্যালঘু ব্লক ভোট কবজায় রাখার জন্য বাবর-পন্থী ভারতীয়রা গড়ে তোলে বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি। বেহায়া ও নির্লজ্জতার চরমে গিয়ে তথাকথিত সেকুলার ও সাম্যবাদীরা রামমন্দিরের বিরোধিতা করে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ও দলীয় ক্যাডাররা রামশিলা পূজনের বিরোধিতায় শারীরিক সংঘর্ষে ময়দানে নেমে পড়ে। আবারও উচ্চ আদালতের রায়ে ৯ নভেম্বর, ১৯৮৯-এ শিলান্যাস নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। পরের বছর ৩০ সেপ্টেম্বর, করসেবার ডাক দেওয়া হয়। একমাস আগেই উত্তরপ্রদেশের মুলায়ম সিংহ যাদব সরকার অযোধ্যায় যাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ করে দেয়। আশ্চর্য হলেও লক্ষাধিক করসেবক তৎকালীন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংগঠন সম্পাদক (বর্তমানে স্বর্গগত) অশোক সিংহলের নেতৃত্বে শ্রীরাম জন্মস্থানে পৌঁছান। শ্রীসিংহল পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত হন। ২ অক্টোবর মুলায়ম সিংহ যাদব সরকারের পুলিশ নিরীহ নিঃশস্ত্র করসেবকদের উপর নির্বিচারে লাঠি গুলি চালায়। ৭৮ জন নিরীহ করসেবককে হত্যা করা হয়। ২০১০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এলাহবাদ উচ্চ আদলতের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ এক সর্বমান্য রায়ে (তিন সদস্যের বেঞ্চ) তথাকথিত বিতর্কিত ২.৭৭ একর মন্দির এলাকা ভগবান শ্রীরামলালার বলে আবারও ঐতিহাসিক রায় দান করেন। মামলা উচ্চতম আদালতে চলে দীর্ঘ প্রায় দশ বছর। এরই মধ্যবর্তী সময়ে রামসেতু ভাঙার চক্রান্ত শুরু হয়। সোনিয়া গান্ধী ও মনমোহন সিংহের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার কোটি কোটি ভারতবাসীর আরাধ্য শ্রীরামচন্দ্রকে কাল্পনিক বলে এফিডেভিট দাখিল করেন। মাহাত্মা গান্ধীর রামরাজ্যের কল্পনাকে পদদলিত করতে এরা সংকোচ করেননি। ৯ নভেম্বর, ২০১৯-এ সর্বোচ্চ আদালত সম্পূর্ণ এলাকাই শ্রীরামমন্দিরের বলে দ্ব্যর্থহীন রায়দান করেন। ৫ আগস্ট, পূজ্য সন্তবৃন্দ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালকের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী নির্মীয়মান মন্দিরের ধর্মীয় বিধি অনুসারে ভূমিপূজন করেন। এখন মন্দির পুনর্নির্মাণ শুধু সময়ের অপেক্ষা।

—বাসুদেব পাল,
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

Umaya

Dry-Fruits
&
Spices

With Best Wishes

Umaya.contact@gmail.com
9831126557

স্বামীজীর ভাবনায় নারীজাতির উত্থান সম্ভব

সুতপা বসাক ভড়

স্বামীজী তাঁর পরিব্রাজক জীবনে তৎকালীন ভারতের সমাজে নারীর অবস্থান প্রত্যক্ষ করেন। এছাড়া তাঁর বিবাহিতা বোনের আত্মহত্যার ঘটনা তাঁকে খুবই আঘাত দেয়। তিনি তাঁর অসংখ্য বক্তৃতা, চিঠিপত্র, কথোপকথনে ভারতীয় নারীর দুঃখ দূর করে তাঁদের উন্নতির বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন— 'এদেশে পুরুষ মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কী করেছিস বল দেখি? স্মৃতি-ফৃতি লিখে, নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ করে এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিন করে তুলেছে। মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এইসব মেয়েদের এখন না তুললে বুঝি তোদের আর উপায়ান্তর আছে? ...মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড়ো হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাত মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ, সে-জাতে কখনও বড়ো হতে পারেনি, কস্মিন্‌কালে পারবেও না।'

সমাজ সংস্কার প্রসঙ্গে স্বামীজী বলছেন, 'তোমাদের সমাজ- সংস্কার মানে তো বিধবার বিয়ে আর স্ত্রী-স্বাধীনতা বা ওইরকম আর কিছু। তোমাদের দুই-এক বর্ণের সংস্কারের কথা বলছ তো? ...তাতে সমস্ত জাতটার কী এসে যায়? তোমাদের মুখে যা সংস্কারের কথা শুনতে পাই, তার মধ্যে অনেকগুলোই অধিকাংশ গরিব সাধারণের স্পর্শই করবে না। তোমরা যা চাও, তা তাদের আছে।'

স্বামীজীর মতে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মূলগতি ও উদ্দেশ্য পৃথক।

সুতরাং, এক্ষেত্রে এতে অন্যকে অনুকরণ করলে পরিণাম আদৌ কল্যাণকর হবে না। এছাড়া নারীমুক্তি ও নারী- সশক্তিকরণের উদ্যোগ, তার পরিকল্পনা, পরিচালনা ও প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রে পুরুষেরাই স্বয়ং ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' শীর্ষক ভাষণে তিনি মাদ্রাজে বক্তব্য রাখেন, 'উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতা। ...আমাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, 'আপনি বিধবাদিগের ও নারীজাতির উন্নতির উপায় সম্বন্ধে কী চিন্তা করেন?' এ প্রশ্নের আমি শেষবারের মতো উত্তর দিতেছি— আমি কি বিধবা যে, আমাকে এই অর্থহীন প্রশ্ন করিতেছ? আমি কি নারী যে, আমাকে বারংবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কে যে, গায়ে পড়িয়া নারী জাতির সমস্যা সমাধান করিতে অগ্রসর হইতেছ? ...তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই পূরণ করিবে।'

১৯০০ সালে ক্যালিফোর্নিয়াতে ভারতের নারীশক্তি বক্তৃতায় তিনি বলেন— '...প্রত্যেক জাতির একটি নিজস্ব মাপকাঠি আছে এবং সেইটি ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা উহার মান নির্ণয় করা সম্ভব নয়।'

ভারতীয় নারীর শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য— 'ইতিবাচক কিছু শেখা চাই। খালি বই-পড়া শিক্ষা হলে হবে না। যাতে চরিত্র তৈরি হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এইরকম শিক্ষা চাই।' ১৮৯৫ সালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন— 'জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষ পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। ...সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে 'স্ত্রী-গুরু' গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার। সেই জন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ মার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতরভাবাপন্না নারীকুলের আকরস্বরূপ হইবে।'

নারীবাদ বিশ্বজুড়ে সমানাধিকারের দাবি করে। অথচ বাহ্যত নারী-পুরুষের মধ্যে কিছু পার্থক্য থেকেই যায়। এক্ষেত্রে স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক ঐক্যসূত্রের ধারণা অত্যন্ত অনুপ্রেরণযোগ্য। তাঁর মতে--- 'পরমব্রহ্মতত্ত্বে লিঙ্গভেদ নেই। আমরা 'আমি-তুমি'র ভূমিতে লিঙ্গভেদটা দেখতে পাই, আবার মন যত অন্তর্মুখ হতে থাকে, তাই ওই ভেদজ্ঞানটা চলে যায়। শেষে মন যখন সমরস ব্রহ্মতত্ত্বে ডুবে যায়, তখন আর 'এ স্ত্রী, ও পুরুষ'— এই জ্ঞান একেবারেই থাকে না। ...তাই বলি, নারী-পুরুষে বাহ্য ভেদ থাকলেও স্বরূপত কোনো ভেদ নেই।'

তাঁর এই ধারণার ভিত্তিরূপে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ স্মরণ করে বলেন— 'ঠাকুরকে দেখেছি, স্ত্রী মাত্রেই মাতৃভাব— তা যে জাতির যেরূপ স্ত্রীলোকই হোক না কেন।'

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নারীমুক্তি ও নারীসশক্তিকরণ সমাজের ব্যবস্থাকেই অনেক ক্ষেত্রে দোষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চলেছে, দীর্ঘদিনের সংস্কার ও পরম্পরাকে ভেঙে চুরমার করতে উদ্যত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যবসা— একটি পরিবারে একটি টিভি, একটি ফ্রিজ ইত্যাদি, অথচ পরিবার ভেঙে গেলে একাধিক টিভি, একাধিক ফ্রিজ। সুতরাং কোম্পানিগুলি নিজেদের লাভের জন্য অন্যায়কেও প্রশ্রয় দিতে পিছ-পা হয় না। সেজন্য হঠকারিতা না করে গভীর চিন্তায়নের প্রয়োজন।

মা, ঠাকুর ও স্বামীজী সনাতন আদর্শের ওপর ভিত্তি করে জীবনের পথ চলার শিক্ষা দিয়েছেন। এখন আমরা সিদ্ধান্ত নেব ব্যবসায়ী ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের প্ররোচনায় বিপথগামী হব, না আদি-অনাদি পরম ব্রহ্মের আলোয় নিজেদের আলোকিত করব। ■

গণতন্ত্র ও সংবিধানের ‘মৃত্যুঘণ্টা’ বাজিয়ে দিয়েছেন মমতা

বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা সারদা চিট ফান্ডের রাজনৈতিক দুর্নীতি সংক্রান্ত কাগজপত্র লোপাট করার অভিযোগে অভিযুক্ত কলকাতার প্রাক্তন নগরপাল রাজীব কুমারকে সিবিআই অফিসারদের হাত থেকে বাঁচাতে যেদিন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার রাজপথে ধরনায় বসেছিলেন, সেদিনেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে সংবিধান সংকটের মুখে। কারণ তিনি গণতন্ত্র ও সংবিধানের মুখোশ পরে প্রশাসনিক নেতৃত্বের অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছেন।

সুজিত রায়

কলকাতার প্রাক্তন নগরপাল এবং বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা সারদা চিট ফান্ডের রাজনৈতিক দুর্নীতি সংক্রান্ত কাগজপত্র লোপাট করার অভিযোগে অভিযুক্ত রাজীব কুমারকে সিবিআই অফিসারদের হাত থেকে বাঁচাতে যেদিন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার রাজপথে ধরনায় বসেছিলেন, সেদিনেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে সংবিধান সংকটের মুখে। এই সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছিল সেদিন, যেদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে একদল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র অপমান ও মারধর করে ঘেরাও করে রেখেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই শুধু নয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সুরক্ষা দিতে রাজ্য প্রশাসনও সেদিন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। বাধ্য হয়ে ছুটে যেতে হয়েছিল রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়কে। সেদিন তিনি ছুটে না গেলে বাবুলের প্রাণরক্ষা এবং বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পালের সম্মানরক্ষা একটা বড়ো প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড়াত নিঃসন্দেহে। যদিও পরে অপদার্থ রাজ্য প্রশাসন এবং শাসকদল রাজ্যপালের ছুটে যাওয়াটাকেই অসাংবিধানিক পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেননি।

আসলে সংবিধানকে নস্যাৎ করে চলা এবং গণতান্ত্রিক বিধানকে পদদলিত করে রাজনৈতিক পদ্ধতির যে ইতিহাস প্রথমে যুক্তফ্রন্ট, তারপর কংগ্রেস এবং তারপরে ৩৪ বছরে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে বপন করেছিল, তাকেই সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছে রাজ্যের বর্তমান শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের পরিচালিত সরকার।

সরকারে বসার প্রথম একমাসেই একজন প্রবীণ এবং সর্বজননমস্য চিকিৎসককে অপমান করে, কামদুনি গ্রামে এক তরুণীর ধর্ষণের প্রতিবাদকারিণীদের ‘মাওবাদী’ হিসেবে চিহ্নিত করে, অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রকে কার্টুন ফরওয়ার্ড করার অপরাধে অভিযুক্ত করে এবং মেদিনীপুরের এক অভাবী যুবককে নেহাৎই আত্মগরিমার বশে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো যে ‘ত্রাসের রাজত্ব’ সৃষ্টি করে হিটলারি জমানার জন্ম দেবার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, আজ প্রায় ১০ বছরের প্রশাসনের মাথায় সেই আগ্রহেরই প্রকাশ চূড়ান্ত আকার নিয়েছে। এবং সমাজবিজ্ঞানীরা তাই আজ নির্বিবাদে বলছেন— পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে সংকটগ্রস্ত রাজ্যের তালিকার শীর্ষে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী গত ১০ বছর ধরে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক সংকট তৈরি

রাজীব কুমার ও অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ধরনা মঞ্চে। (ফাইল চিত্র)

করেছেন একের পর এক এবং পশ্চিমবঙ্গ 'ক্রাইসিস স্টেট' হিসেবে দুর্নাম কুড়োতে বাধ্য হয়েছে। এখন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের মুখে যখন মানুষের বিতৃষ্ণা আর অভক্তির চাপে রাজ্য সরকারের শ্বাস রুদ্ধ, যখন গোটা রাজ্যে শাসকদলের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে, যখন রাজ্যের মন্ত্রীরাই মুখ খুলছেন বাধ্য হয়ে যে এ রাজ্যের মন্ত্রীসভাটা জনগণের নির্বাচিত নয়। দলটা আসলে একটা কোম্পানি, তার ডিরেক্টর দুজন—পিসি আর ভাইপো, যখন তারা প্রকাশ্য সমাবেশে বলছেন— তাদের কোনো স্বাধীনতা নেই, তখনই শাসক দল আরও সন্ত্রাসী চেহারা নিচ্ছে। সে সন্ত্রাস এতটাই ভয়ংকর যে এরাজ্যের প্রধান প্রতিপক্ষ এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ দল ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতির ওপরও মারমুখী আক্রমণ সংগঠিত হয়, অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত নেতা-নেত্রীদের বহিরাগত তকমায় ভূষিত করা হয় এবং যে সংখ্যালঘু ভোট ছিল শাসকদলের রক্ষাকবচ সেই মুসলমান ভোটের অন্য মেরুকরণের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও দিনে-দুপুরে ভুল বকছেন এবং মানুষের 'দুয়ারে সরকার'-কে হাজির করে একের পর এক প্রকল্পের স্তোকবাক্য আউড়ে ভোটবাক্স ভারী করার চেষ্টা করছেন। আর্থিক ঘুষ দিয়ে বশে রাখছেন যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ এবং রাজ্যের আর্থিকভাবে দুর্বল জনসমাজকে যাদের উন্নয়নের বিন্দুমাত্র নজিরও তিনি গত দশ বছরে সৃষ্টি করতে পারেননি।

যে কোনো রাজনীতির ধাত্রীভূমির মূল স্তম্ভ হলো দুটি— মূল্যবোধ ও আদর্শ। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র— সর্বত্রই এই বোধ সুপরিশীলিত ভাবে বিচার্য বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে কোনও রাষ্ট্র বা রাজ্যের গণতন্ত্র এবং সংবিধান সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই যখন প্রশাসন দুর্নীতির তাগিদে মূল্যবোধ এবং আদর্শ বিমুক্ত হয়ে চলতে শুরু করে সমষ্টির কথা না ভেবে, সমষ্টিকে গুরুত্ব না দিয়ে।

জন্মাবধি সামাজিকভাবে বেড়ে ওঠা মানুষ কোনো কিছুকে দেখে বা চেনে তার আশৈশব পালিত বিশ্বাস, ধারণা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতেই। এবং তারই প্রতিফলন ঘটে রাজনৈতিক মূল্যবোধে। অতএব রাজনৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি হলো সমাজ-লালিত ও সমর্থিত মূল্যবোধ। সাধারণ মানুষ ভোট দেবার সময়ও এই আদর্শ ও মূল্যবোধ দ্বারাই পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেও মানুষ এই মূল্যবোধের উপস্থিতি আশা করে। এভাবেই দেশে দেশে এক এক সময় এক এক রকম প্রশাসন গড়ে ওঠে। কোথাও গড়ে ওঠে ঈশ্বরবাদ, কোথাও বামবাদ, কোথাও সাম্যবাদ, কোথাও একনায়কত্ব। রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রশাসনের রূপ ভিন্ন হতে পারে কিন্তু উদারনৈতিক গণতন্ত্রে (ভারতকে যার প্রতিভূ বলে মনে করা হয়) এটাই আশা করা যায়, নাগরিকদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আকাঙ্ক্ষা তাদের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে প্রতিফলিত হবে এবং তাঁরা বহন করবেন— ১. নাগরিকতা, ২. দায়িত্বশীলতা, ৩. সহনশীলতা, ৪. ন্যায়বোধ, ৫. নেতৃত্বের সক্ষমতা, ৬. অধিকারবোধ, ৭. স্বাধীনতার চেতনা, ৮. নিরপেক্ষতা এবং ৯. স্বীকৃতি পাওয়া ও দেবার মানসিকতা।

সমস্যা হলো, কমপক্ষে গত ৩০ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক প্রশাসকরা এই সমস্ত জরুরি বিষয়গুলিকে শুধুমাত্র থিয়োরি হিসেবেই মেনে এসেছেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এর প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করেননি।

পশ্চিমবঙ্গকে বলা হয় রাজনৈতিক স্পর্শকাতর ও সচেতন রাজ্য। এবং রাজ্যের সম্পর্কে এই ধারণাটা গড়ে উঠেছে দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ এ রাজ্যের মানুষ বিশ্বাস করে, সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ নয়, পরিবর্তনশীল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনই গণতন্ত্র। ব্যক্তি ও সমষ্টি— দুটি ক্ষেত্রেই এই বিশ্বাস আসক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ৩৪ বছরের বাম শাসনে সমষ্টির এই বিশ্বাসকে কখনই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তারা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন লেনিনের বক্তব্য যে ঔপনিবেশিক প্রশ্নে ভারতীয় কমিউনিস্টদের মূলস্রোতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে হাত ধরেই চলা প্রয়োজন।

পরবর্তীকালে এরাজ্যের বামপন্থীরা যদি লেনিনের বক্তব্যকে শিরোধার্য করতেন তাহলে একটা বিস্ময়কর রাজনৈতিক ফলিত রূপ ভারতবর্ষ অনুধাবন করতে পারত। মার্কসবাদের চর্চা যদি সত্যই যেভাবে লালন করে আসা হয়েছে তা যদি সর্বজনগ্রাহ্য হতো, তাহলে লুম্পেন রাজনীতি এত প্রাধান্য পেত না। আর সেই বাম প্রশাসনের শেষ কুড়ি বছরের সর্বগ্রাসী ভুল রাজনীতিই টেনে এনেছে এক নয়া রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যার না আছে ধড় (কাঠামো), না আছে শির (মস্তিষ্ক)। শুধু মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, গোয়েবলসীয় প্রচার আর নীল সাদা রং ও এল ই ডি আলোর রুজ মাখিয়ে 'উন্নয়ন'কে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে, গরিবকে আরও গরিব বানিয়ে, মধ্যবিত্তকে ভিখারি বানিয়ে, যুবা তরুণদের ঘুষখোরে পরিণত করে টানা ১০টা বছর প্রশাসনের তখতে থেকে গেল একটা সার্কাস পার্টি— এটাই আশ্চর্য।

আয়তনের হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের ১৪তম রাজ্য। জনসংখ্যার হিসেবে চতুর্থ। কিন্তু

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্রমণের মুখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। (ফাইল চিত্র)

রাজ্যে তদন্তে আসা সি বি আই অফিসারদের আটকানোর চেষ্টা করছে কলকাতা পুলিশ। (ফাইল চিত্র)

চলতি বছর ওই দশ বছরের 'দুঃশাসন' যখন ভোট নামক যুদ্ধে এবার বিজেপি নামক এক অপরিসীম শক্তিধর রাজনৈতিক শক্তির মুখোমুখি, তখন নির্বাচনী গুরুত্বের মাপকাঠিতে পশ্চিমবঙ্গ এখন জাতীয় পর্যায়ে সব রজ্যের শীর্ষে। হাওয়া উঠে গেছে— তৃণমূল শুধু নয়, মমতা এবার হারবেন। হারবেনই প্রধান প্রতিপক্ষের কাছে। কারণ গত দশ বছর ধরে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে তিনি মানুষের বিশ্বাস— গণতন্ত্র ও সংবিধানকে নস্যাৎ করে প্রশাসন পরিচালনা করেছেন। গণতন্ত্র ও সংবিধানকে পদদলিত করে রাজ্যটাকে কয়লা পাচার, বালি পাচার, মাটি পাচার, গোরু পাচার, সোনা পাচারের কেন্দ্রভূমি করে তুলেছেন। কালীঘাট (মুখ্যমন্ত্রীর পাড়া) এখন আর মাকালীর আবাস নয়। সেটি এখন ব্যানার্জিপাড়া— জমিদারি একটি পরিবারেরই, এমনকী আদিগঙ্গাও দখল করেছে ব্যানার্জি পরিবার। মানুষ সম্মান পায়নি। বিরোধী দল সম্মান পায়নি। সম্মান পায়নি সরকারি কর্মচারী, আমলারা, শিক্ষকরা, অধ্যাপকরা, ছাত্র যুবরা, মহিলারা। সমাজের বিভিন্ন অংশকে উন্নয়নের মূল স্রোতে টানার বদলে শুধু অমুকশ্রী, তমুকশ্রী নামে প্রকল্প গড়ে সরকারি কোষাগার তছরূপ করেছেন। এমনকী সংখ্যালঘুদের যে ৩০ শতাংশ ভোটকে তিনি ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে এতদিন ব্যবহার করে এসেছেন, তাঁদেরও উন্নয়নের পথের সন্ধান দেননি ছিঁটেফোঁটাও। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের মোটা অঙ্কের অর্থ স্কলারশিপ দিয়েছেন, কিন্তু তারা পড়ছে কিনা, স্কুলে কলেজে যাচ্ছে কিনা, ফলাফল করছে কেমন তা পর্যবেক্ষণ করা হয়নি। এবার মুসলমানরাও বুঝে গেছেন, তাঁদের নিয়ে দশ বছর ধরে ভোটের খেলা খেলেছেন মমতা। তাই মুসলমান ধর্মগুরু ও রাজনৈতিক নেতারও স্লোগান তুলেছেন— এবার ভোট, নয়া জোট। দশ পার্টির জোট গড়ে উঠছে এবার পশ্চিমবঙ্গে। বেশিটাই সংখ্যালঘু ভোটের মেরুকরণ ঘটাতে। একদিকে এই নয়া জোটের হুংকার, অন্যদিকে বিজেপির 'আর নয় অন্যায়' স্লোগানকে ভিত্তি করে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশের পর সমাবেশ— রাজ্যের শাসক দল ও সরকারকে তছনছ করে দিয়েছে।

রাজ্য বিধানসভার আসন ২৯৪টি। ১৪৮টি আসন হাতে পেলেই সরকার গড়বে যে কোনো দল। ২০১৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ২১১টি আসন। তার আগে ২০১১-য় পেয়েছিল ১৮৪টি। ২০১৬-তে বিজেপি পেয়েছিল মাত্র তিনটি আসন। কিন্তু তবুও শুধুমাত্র গণতন্ত্র ও সংবিধানকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে প্রশাসন চালানোর যে ঝোঁক অর্জন করেছেন মমতা— তরই জের ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে জিতিয়ে দিল ১৮টি আসনে। তার মানে কম বেশি ১২৫টি বিধানসভা আসনে। এখন বিজেপির টার্গেট দুটি— আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ২০০ আসন করায়ত্ত করা এবং পশ্চিমবঙ্গকে 'সোনার বাঙ্গলা'য় পরিণত করা। কারণ সত্যিই— বঙ্গমাতা আজ সর্বহারা। তার শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তার শিল্প উন্নয়ন প্রচেষ্টা ধামাচাপা পড়ে রয়েছে। তার সংস্কৃতিতে ভর করেছে লুম্পেনরাজ, পাচার সংস্কৃতি ও সিন্ডিকেটরাজ।

মানুষ এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এবার বদলা নেবার পালা। বদলার পালা শুরু হয়ে গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও। কারণ অর্বাচীন প্রশাসনিক পদক্ষেপে দলীয় মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদদেরও মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগত চাকরে পরিণত করেছেন। একথা বলছেন মন্ত্রীরা, বিধায়করা, সাংসদরা প্রতিদিন। আর প্রতিদিন দলটা মালদা-মুর্শিদাবাদের গঙ্গাপারের মতে ভাঙছে। ভাঙন অব্যাহত। আগামী ৪-৫ মাসে ভোটের আগে দলটার অস্তিত্ব থাকবে কিনা— তা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেছে।

আজ বিপর্যয়ের হাত থেকে দলকে বাঁচাতে মমতা এখন ধুয়ো তুলেছেন ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের। অর্থাৎ বাঙ্গালির সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে বিজেপির হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামা। 'বাংলা পক্ষ' নামে একটি অরাজনৈতিক প্লাটফর্ম গড়ে তুলে (অপ্রত্যক্ষ ভাবে) আরও বেশি বিপদ ডেকে এনেছেন। আর মুখ্যমন্ত্রী নতুন স্লোগান— 'জয় বাংলা' বাঙ্গালিকে ঘাসফুল থেকে সরিয়ে দিচ্ছে আরও দূরে। কারণ মানুষ জানে, 'জয় বাংলা' স্লোগান তুলে তিনি কি ভয়াবহ খেলা খেলতে চলেছেন।

স্বামীজী বলে গিয়েছিলেন— চালাকির দ্বারা মহৎকাজ সম্পন্ন করা যায় না। তৃণমূল সুপ্রিমো শুধু চালাক নয়, অতি চালাক। সেই অতি চালাকির জন্য এবার বহুকাঙ্ক্ষিত প্রবাদটির মতো 'গলায় দড়ি'র ফাঁস অবশ্যম্ভাবী। কারণ তিনি গণতন্ত্র ও সংবিধানের একটা মুখোশ পরে প্রশাসনিক নেতৃত্বের অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছেন। ক্ষমতা দখলের রাজনীতি, পেশীশক্তির প্রাধান্য, ক্ষমতার লোভ, তোলাবাজি, আর্থিক দুর্নীতি, আত্মম্ভরিতা এবং সেইসঙ্গে সমস্তরকম সংবাদমাধ্যমকে ভয় দেখিয়ে গিয়ে রেখে মমতা ব্যানার্জি গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক রীতিনীতির পরাকাষ্ঠাকেও ধুলিসাৎ করে ভারতীয় সংস্কৃতির মুখে চুলকালি মাখিয়েছেন। পাশ্চাত্য ধাঁচের শুধুমাত্র অধিকার কেন্দ্রিক উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিজেই ফেঁসে গেছেন। ফলত সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গ এত বড়ো বিপদের সম্মুখীন হয়নি কখনও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদা ব্রিগেডে বামফ্রন্টের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছিলেন। এবার কি তাহলে মানুষের ঘরে ঘরেই বাজবে মমতা-বিদায়ের মৃত্যুঘণ্টা? ■

পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি এবং গণতন্ত্র

অতীত ও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতের নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি

বিমল শঙ্কর নন্দ

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের গণপরিষদ ভারতের জনগণের পক্ষে দেশের সংবিধান গ্রহণ করে। এই সংবিধান কার্যকরী হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। সেই হিসেবে ২০২১ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখে ভারতের সংবিধান কার্যকরী হওয়ার ৭১তম বর্ষপূর্তি। ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার ৭৪তম বর্ষ। আর ঠিক এক বছর পরে ২০২২ সালে স্বাধীন ভারত তার ৭৫তম বর্ষে পদার্পণ করবে। গত সাত দশকেরও বেশি সময়কালে ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোটি বহু সমস্যার মধ্যেও তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। আঘাত যে একেবারে আসেনি তা নয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ঘোষিত জরুরি অবস্থা এ দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর এক মারাত্মক আঘাত ছিল, তবু ভারত সেই আঘাত সামলে নিয়েছে। ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে জরুরি অবস্থার মূল স্থপতি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশে সাধারণ নির্বাচন ডাকতে বাধ্য হন। আর জরুরি অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ স্বৈরাচারের জবাব দেয় ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসকে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বিপুলভাবে পরাজিত করে। মনে রাখতে হবে, সেই সময় দেশের জনসংখ্যার মাত্র ৩৫ শতাংশের মতো মানুষ ছিল শিক্ষিত। আর টেলিভিশনের মতো জনপ্রিয় গণমাধ্যম তখনও সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে মানুষ স্বৈরাচারের জবাব দিয়েছিল ব্যালট বাক্সে। মানুষের এই গণতান্ত্রিক মননই ভারতীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীন হওয়া দেশগুলোর মধ্যে অধিকাংশই যখন স্বৈরাচারের কবলে চলে যায়, ভারত তার গণতন্ত্রের ধ্বজাটিকে ধরে রেখেছিল শক্ত হাতে। এ কারণে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের মর্যাদা পেয়েছে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে।

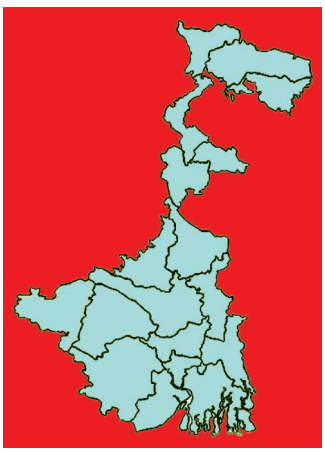

৬০-এর দশকের শেষ থেকে চালু হওয়া রাজনীতি বাঙ্গলার গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং সংস্কৃতিকে নষ্ট করেছে, যার পুনর্নির্মাণ একান্তভাবে জরুরি। বিহার পেরেছে, বাংলাকেও পারতে হবে। এবারের গণতন্ত্র দিবসে এটাই হোক বাঙ্গালির শপথ।

ভারতের এই গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ভারতের সমস্ত অঙ্গরাজ্য। কিন্তু একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের নিজস্ব কিছু ইতিহাস এবং ঐতিহ্য থাকে। থাকে নিজস্ব রাজনৈতিক সংস্কৃতি। ভারতের স্বাধীনতার সময় যে দুটি অঙ্গরাজ্যকে ভাগ করা হয়েছিল তার একটি হল বাঙ্গলা। সেই হিসেবে ২০২২ সালে পশ্চিম বাঙ্গলাও ৭৫তম বর্ষে পদার্পণ করবে। দেশভাগ, লক্ষ লক্ষ মানুষের সব হারিয়ে এ দেশে আশ্রয় নেওয়া প্রভৃতি পরিস্থিতি সামলে এ রাজ্য ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম দু-দশক বাদ দিলে পশ্চিম বঙ্গে রাজনীতিতে সবচেয়ে যে প্রশ্নটি বারবার উঠে এসেছে তা হলো গণতন্ত্রের প্রশ্ন। এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পেরিয়ে এসেও গণতন্ত্রের প্রশ্নটি এ রাজ্যের রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

দেশভাগজনিত বিশৃঙ্খলা, লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে উৎখাত করার ফলে এ রাজ্যের উপর ব্যাপক জনসংখ্যার চাপ প্রভৃতি সত্ত্বেও এ রাজ্যের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়নি। কারণ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও বাংলার তৎকালীন জাগ্রত মনীষা পশ্চিমবঙ্গ গঠনের জন্য তৎপর হয়েছিল হিন্দু বাঙ্গালিকে একটি ধর্মোন্মাদ আগ্রাসী রাজনৈতিক শক্তির হাত থেকে রক্ষা করে এক উন্নত গণতান্ত্রিক সমাজের অঙ্গীভূত করতে। ফলে দেশভাগের তিক্ত স্মৃতি ভুলে বাঙ্গলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সাধারণ মানুষ রাজ্যের গণতান্ত্রিক কাঠামোটিকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। তবে বাঙ্গলার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সামনে বিপদের ইঙ্গিতও ছিল। ১৯৫২ সালের প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দল জয়লাভ করলেও প্রধান বিরোধী শক্তি হয়ে ওঠে কমিউনিস্টরা। এরপর গোটা ৫০ এবং ৬০-এর দশকে বাঙ্গলার কমিউনিস্ট রাজনীতির চরিত্র ও

গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসবে রক্তাক্ত পশ্চিমবঙ্গ

প্রকৃতিটিকে বিশ্লেষণ করতে দেখা যাবে যে, কমিউনিস্টদের লক্ষ্যই ছিল প্রচলিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও কাঠামোগুলোকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, সেগুলোকে দুর্বল করা, প্রয়োজনে ভেঙে দেওয়া। বিধানসভায় কমিউনিস্ট কিংবা আধা কমিউনিস্ট দলগুলোর কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে এই সত্যটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর বিধানসভার বাইরে রাজনীতির বৃহত্তর পরিসরেও কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির ভূমিকা ছিল মারাত্মক। বিরোধী দল সরকারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে আন্দোলন করবে— এটা এক স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু ৫০ এবং ৬০-এর দশকে এ রাজ্যের বিরোধী কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বাম দলগুলির আন্দোলন গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ধারে পাশেও ছিল না। এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে কলকাতার রাস্তায় একের পর এক ট্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া (ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত সরকার নেয়নি, নিয়েছিল ব্রিটিশ মালিকানাধীন সংস্থা), খাদ্য আন্দোলনের নামে গোটা রাজ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা প্রভৃতি ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিক বিপদ আছে। কিন্তু বাস্তবে কেউই এই সম্ভাবনাটিকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। গুরুত্ব দিলে বাঙ্গলার রাজনীতি হয়তো অন্য খাতে বইতো।

১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শাসক কংগ্রেস দল খারাপ ফল করে। ২৮০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ১২৭টিতে জয়লাভ করে ক্ষমতা দখলে ব্যর্থ হয়। ক্ষমতায় আসে যুক্তফ্রন্ট এক্স যার মূল চালিকা শক্তি ছিল ১৯৬৪ সালে সি পি আই ভেঙে তার কট্টরপন্থী অংশকে নিয়ে তৈরি হওয়া সি পি আই (এম)। প্রথম যুক্তফ্রন্ট আমলেই শুরু হয় নকশাল আন্দোলন, যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল সি পি আই (এম)-এর আরও কট্টরপন্থী অংশ, যারা মনে করত চীনের ধাঁচে ভারতে কৃষি বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করা প্রয়োজন। চীনের নেতা মাও সে তুংকে ভারতের নেতা হিসেবে মেনে নেওয়া যেতে পারে। (চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান— স্লোগান দিয়ে তখন রাজ্যের দেওয়ালগুলো ভরিয়ে দেওয়া হয়েছিল)। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের কিছুদিন পরেই উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া প্রভৃতি অঞ্চলে শুরু হয় অতিবাম নকশাল আন্দোলন, যা ৬০-এর দশকের শেষ থেকে ৭০-এর দশকের প্রথম কয়েকটি বছর ধরে চলেছিল এবং যার অভিঘাতে বাঙ্গলার সমাজ ও রাজনীতি প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে বেশি আঘাত এসেছিল রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর। নকশাল আন্দোলন দমনে প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের অনীহা এবং গা-ছাড়া মনোভাব সরকারি প্রক্রিয়া ও

ফঃ ৪

কাঠামোর উপর মানুষের বিশ্বাস কমিয়ে দিচ্ছিল। আর ৭০-এর দশকের শুরুতে চারু মজুমদারের ভাবনা অনুসরণ করে আরবান গেরিলা স্কোয়াড গঠন এবং ব্যক্তিহত্যার উন্মাদ রাজনীতি গোটা বাঙ্গলায় সৃষ্টি করেছিল এক আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার আবহ। বিপর্যস্ত হয় পড়েছিল গোটা সামাজিক ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক কাঠামো।

১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠা এবং নকশাল আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাঙ্গলার সমাজে কিছুটা সুস্থিতি ফিরিয়ে এনেছিল ঠিকই। কিন্তু রাজ্যের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর এর প্রভাব ছিল সুদুরপ্রসারী। ১৯৭০-৭১ সাল থেকেই কংগ্রেস দল কেন্দ্রের মদতে নকশাল দমনে নিজেদের দলের সদস্যদের মাঠে নামাতে শুরু করে। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির দ্বন্দ্ব সামাজিক পরিসরে বিস্তৃত হয়। আর ১৯৭২ সালে ক্ষমতায় আসতে অত্যন্ত আগ্রহী কংগ্রেস দল বিধানসভা নির্বাচনে এক নতুন সংস্কৃতির আমদানি করে। তা হলো রিগিং এবং বুথ দখলের মাধ্যমে ভোটে জেতার চেষ্টা। এর আগের নির্বাচনগুলিতেও পেশিশক্তির প্রয়োগ হতো। তবে তা একেবারে বিক্ষিপ্তভাবে এবং অল্প পরিমাণে। ১৯৭২ সালে নির্বাচনে জিততে কংগ্রেস রিগিং, বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট প্রভৃতি অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। ২৮০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে অল্প কয়েকটিতে এই পদ্ধতির আশ্রয় নিলেও বাঙ্গলার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সামনে এটি ছিল এক অশনিসংকেত। এই অসুখের হাত থেকে বাঙ্গলার রাজনীতি আজও মুক্তি পায়নি। কারণ, এই পদ্ধতির প্রয়োগ পরবর্তী কালে শাসক দলগুলো ব্যাপকভাবে করেছে।

১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দল রিগিংয়ের আশ্রয় নিয়েছিল এটা এক প্রতিষ্ঠিত সত্য। এই রিগিং-এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার ছিল পরাজিত সি পি আই (এম)। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভোট জালিয়াতি ও রিগিংয়ের অভিযোগ তুলে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত বিধানসভা বয়কট করেছিল সি পি এম। কিন্তু বাংলার রাজনীতির ট্র্যাজেডি হলো ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর রিগিং এবং ভোট জালিয়াতিকে প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল সিপিএম। শুধু ভোট জালিয়াতি নয়, সমাজের সর্বত্র রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটানো, সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থাটিকে কুক্ষিগত করে তার স্বাধীন অগ্রগমণকে আটকে দেওয়া, সমাজের সর্বস্তরে ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রচলন ঘটানো— সি পি এমের এই ভয়ংকর নীতিগুলো বাঙ্গলার সমাজের গণতান্ত্রিক কাঠামোটিকেই নষ্ট করে দিয়েছে। সি পি এমের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী নীতি ও মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মসনদে আসীন হওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকাও প্রায় একই, কিংবা কোথাও কোথাও আরও খারাপ। ৬০-এর দশকের শেষ থেকে এ রাজ্যের গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর আঘাত হেনে তাকে বিপর্যস্ত করার যে প্রক্রিয়া চলছিল, তাকে বন্ধ করার বা গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কোনো সৎ চেষ্টা দেখা যায়নি। দেখার সম্ভাবনাও বোধহয় নেই।

অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের নির্মাণ করতে হয়। বাঙ্গলার অতীত রাজনীতি, বিশেষত ৬০-এর দশকের শেষ থেকে চালু হওয়া রাজনীতি বাঙ্গলার গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং সংস্কৃতিকে নষ্ট করেছে, যার পুনর্নির্মাণ একান্তভাবে জরুরি। গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো এক মুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে মানুষ অবাধে তার গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। অন্যান্য সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার স্পষ্ট বিভাজনরেখা থাকবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয় রাজনীতির আওতার বাইরে থেকে তাদের ভূমিকা পালন করবে। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন। এই পরিবর্তন সেই রাজনৈতিক দলের পক্ষেই আনা সম্ভব, যারা প্রকৃতিগতভাবে গণতান্ত্রিক আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। চেষ্টা করবে যে একটি রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বদল আনা যায় তার উদাহরণ বিহার। লালুর 'জঙ্গলরাজ'-এর স্মৃতিকে দূরে সরিয়ে বিহারের সমাজ ও রাজনীতিতে গণতন্ত্র অনেকটাই ফিরে এসেছে। অন্য সব কিছু বাদ দিলেও এই একটি কারণে বিহারে নীতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেড এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে বিহারের মানুষ চিরদিন মনে রাখবে। বিহার পেরেছে, বাঙ্গলাকেও পারতে হবে। এবারের গণতন্ত্র দিবসে এটাই হোক বাঙ্গালির শপথ। ■

উদ্যোক্তা :- মনু আর.ডি. ব্লক

স্বচ্ছ ভারত উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৩০শে নভেম্বর ২০২০ এস কে পাড়া রেল স্টেশনে প্লাস্টিকমুক্ত অভিযান পালন করা হয়। এবং মনু আর ডি ব্লকের ৩১টি ব্লক কমিটি সহ ব্লকভিত্তিক সাফাই অভিযান করা হয়। মনু আর ডি ব্লকের বিভিন্ন বাজার, হাসপাতাল, স্কুল এবং বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে (জনবসতি) জনজাগরণ করা হয় স্বচ্ছতা বিষয়ে।

Advt

With Best Compliments from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

ভারতের বাইরে রামায়ণের প্রভাব

স্বপন ঘোষ

ভারতবর্ষের বাইরে হিন্দু সভ্যতার বিস্তারলাভ করেছিল তার মধ্যে অন্যতম কাম্বোডিয়া। যার প্রাচীন নাম কম্বোজ দেশ। রামায়ণী সভ্যতার ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল এ কাম্বোডিয়ায়। কাম্বোডিয়া বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা দেশ। কাম্বোডিয়া মানে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো হিন্দু মন্দির আঙ্কোরভাট আর অপূর্ব রামায়ণ ভাস্কর্যের দেশ। এদেশের মহাকাব্যের নাম রামাকেয় রামাকৃতি। এই মহাকাব্যের মূল চরিত্র— শ্রীরাম, শ্রীলক্ষ্মণ, সীতাদেবী, হনুমান আজও অবলীলাক্রমে কম্বোডিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যেখানে দেশের রাজাকে দেবতা রূপে পুজো করা হতো তার সূচনা হয় কাম্বোডিয়ার। কাম্বোডিয়াবাসীর আরাধ্য দেবতা হলেন বিষ্ণু ও শিব। পরবর্তীকালে এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পড়ে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কম্বোজের রাজারা হিন্দু সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তার করেছিলেন, যা আজও জনপ্রিয়। কাম্বোডিয়ার প্রতিবেশী দেশ চম্পা যা আধুনিক ভিয়েতনাম নামে পরিচিত। এই ভিয়েতনামও ছিল ভারতীয় সভ্যতার আকর কেন্দ্র। ভিয়েতনামে মাই-সন বলে একটি জায়গায় বিশাল এক মন্দির প্রাঙ্গণ রয়েছে যা অতীতে ভদ্রেশ্বরা শিবমন্দির বলে বিখ্যাত ছিল। এটি বর্তমানে UNESCO-র রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে। প্রভুতত্ত্ববিদদের মতে এই মন্দির প্রাঙ্গন আঙ্কোরভাটের থেকেও বড়ো। এখানে My-Son Inscription নামে একটা শিলালেখা পাওয়া যায় যা রাজা ভদ্রবর্মণের শিলালেখা নামে পরিচিত। আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় এই মন্দির প্রাঙ্গনটি কার্পেট বম্বিংয়ের জন্য নষ্ট হয়ে যায়।

রামায়ণী সভ্যতার কথা বলতে গেলে ভারতবর্ষের বাইরে ভারতীয় সংস্কৃতির যে মহান নিদর্শনগুলি সারা বিশ্বের মানুষ দেখতে আসেন তারা আসলে বিদেশের মাটিতে ছাড়িয়ে ভারতবর্ষকেই দেখেন। বর্তমানে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, বালি, জাভা, কাম্বোডিয়া, লাওস ও মায়ানমারের মানুষ রামায়ণকে অনুসরণ করে চলেছে। মালয়েশিয়া, সুমাত্রা ও বোর্নিওতে রামায়ণের প্রভাব রয়েছে। ধর্মীয় বিধিনিষেধের জেরে দ্বীপগুলিতে রামায়ণের প্রভাবকে মুছে ফেলার চেষ্টা অব্যাহত। মালয়েশিয়ায় রামায়ণ 'হিকায়েত-সেবী-রামা' নামে পরিচিত। মালেশিয়ায় 'ওয়েয়াং সিয়াম' রামায়ণী নৃত্য ও পুতুল নাটক ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। সারা দেশের হাজার হাজার মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বছরে প্রায় ৩০০-র বেশি অনুষ্ঠান হতো। কিন্তু ১৯৭০ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে প্রায় সব নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এদিকে লাওসের Vat Phou Temple UNESCO-র রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে। প্রতি বছর এখানে Vat Phou উৎসব হয়। মন্দির প্রাঙ্গনে হাজার হাজার লাওসবাসী ফুল নিয়ে আসেন পুজো দিতে। যাদের শারীরিক ক্ষমতা আছে তারা পুজোর ডালি নিয়ে পৌঁছে যান সুউচ্চ লিঙ্গ পর্বতের সেই আশ্চর্য জায়গাটিতে। লাওসে 'ফ্রালাম সাদোক অর্থাৎ রামজাতক বলে একটি রামায়ণ চর্চা হয়। লাওসের রামায়ণে রাবণের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হনুমান এখানে শ্রীরামের পুত্র।

বাল্মীকি রামায়ণ ইন্দোনেশিয়াতে 'কাকাবেন' নামে পরিচিত। রামায়ণ থেকে উৎসারিত কাকাবেন বালি, জাভা ও জাকার্তায় ব্যাপক জনপ্রিয়। বালীতে সর্বত্র রামায়ণের প্রতিচ্ছবি বালির হোটেলে গরুড়ের ওপর শ্রীবিষ্ণুর মূর্তির কারুকার্য আর বালির ভেনপাসার মূল রাস্তায় রামায়ণের আধার নির্মিত মূর্তি। বালি বোটানিক্যাল গার্ডেনে রামচন্দ্রের স্বর্ণমৃগ বধের মূর্তি রয়েছে।

বহির্ভারতে রামায়ণের প্রভাব যদি আমরা অনুসন্ধান করতে চাই তাহলে প্রথমেই যেদিকে আমাদের নজর পড়বে সেটি হলো থাইল্যান্ড বা সিয়াস। থাইল্যান্ডের মহাকাব্য 'রামাকিয়েন'। থাইল্যান্ডের রাজপরিবারের শ্রীরামচন্দ্র ভগবান বিষ্ণুর অবতার রূপেই পূজিত। ভগবান শ্রীবিষ্ণু রাজ-পরিবারের আন্তরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভিত্তি। থাইল্যান্ডের রাজারা নিজেদের নামের আগে রামা-১, রামা-২ উপাধি নেন। থাইল্যান্ডের রাজপ্রাসাদ থেকে বিমান বন্দর সর্বত্র হিন্দু সাংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি, রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে রামায়ণের ভাস্কর্য, ব্যাংকক বিমান বন্দরে সমুদ্র মন্থনের স্থাপত্য।

বালিদ্বীপেও রামায়ণের অসম্ভব জনপ্রিয়তা। বালিতে ছৌনৃত্যের মতো মুখোশ পরে নাচ জোগেদ নৃত্য, কেকাক নৃত্য রামায়ণকে কেন্দ্র করে। রামায়ণের জনপ্রিয়তা বর্তমানে বালিদ্বীপের 'উবুদ'-এ প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় রামায়ণ অভিনীত হয়। সন্ধেবেলায় উবুদে, ডেনপাসারে খুব তাড়াতাড়ি দোকান বাজার বন্ধ হয়। রাজবাড়ির গেটের সামনে ও রেঁস্তরাগুলির সামনে বালিদ্বীপের ছেলে-মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকে টিকিট নিয়ে। তারা পথচলতি মানুষকে অনুরোধ করে রামায়ণ নাটক দেখার জন্য। ডেনপাসারে রামায়ণ নৃত্যনাট্য অতি জনপ্রিয় ব্যয়বহুল। সেখানকার ধনী ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে কাকাবীন রামায়ণ অভিনয় করায় ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণী সভ্যতার প্রভাব ব্যাপক। এখানকার বহু রাজপ্রাসাদ ও ধনীর গৃহে রামায়ণের চিত্র খোদাই করা রয়েছে। জাভার ক্যান্ডিলার জয়ারাং মন্দিরের গায়ে রামায়ণের বহু ঘটনার চিত্র খোদাই করা রয়েছে। ■

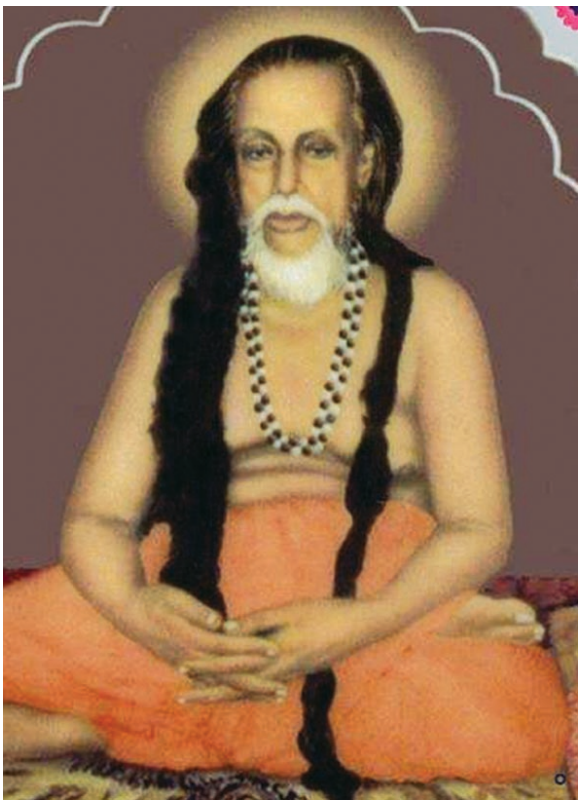

রাজাপুরের সেই অচিন গাছ

অমিত ঘোষ দস্তিদার

১২৯৮ বঙ্গাব্দের কথা। রাজাপুর বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত বরিশাল জেলার বাখরগঞ্জের কাছে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। কালীসিদ্ধ ব্রাহ্মণ উমাচরণ চক্রবর্তী সেই গ্রামে বাস করতেন। এই সাধক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর নাম চিন্তামণি দেবী। চিন্তামণি দেবী খুবই সাধ্বী ছিলেন। তাঁর তৃতীয় গর্ভের সন্তান দুর্গাপ্রসন্ন।

দুর্গাপ্রসন্ন পৃথিবীতে এসেছিলেন ৩০ কার্তিক, রবিবার, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ। সঙ্গে তিনি এনেছিলেন বিবেক, বৈরাগ্যফল ও ভক্তিসুধা। শারদীয়া রাসপূর্ণিমার নিশি সেদিন ছিল জ্যোৎস্নাপ্লাবিত। উৎসবের মুখরতায় সবুজ ধানক্ষেতে শিশিরের সাদা চাদর দুলিয়ে বাতাস তার সুরভিত কারুকাজ করে চলেছিল। হুলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনির সঙ্গে পৃথিবীতে আসা শিশুর কান্না ওঁ ধ্বনিতে আনন্দ হিল্লোল বইয়ে দিল।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা শিশুর মুখান্নপ্রাশন যথাসময়ে করে নাম রাখলেন দুর্গাপ্রসন্ন। দুর্গাপ্রসন্নের জন্মের পর থেকে পিতার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে, অভাব দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে। পিতার সঙ্গে পুত্রের খুবই ভাব। পিতার সঙ্গেই স্নান, আহার ও শয়ন করেন দুর্গাপ্রসন্ন। যথাসময়ে হাতেখড়ি হয়, পাঠশালায় যেতে শুরু করেন। সহপাঠীদের সঙ্গে খেলাধুলা করেন। কিন্তু সময়ের বেশির ভাগটা ব্যয় করেন ধ্যান করে। ছোটোবেলা থেকেই কালীসাধক পিতার পঞ্চমুণ্ডী আসন তাঁকে আকর্ষণ করত।

বালক দুর্গাপ্রসন্ন নিজে গান লিখতেন, তারপর নিজেই সুর দিয়ে সেই গান গাইতেন। উপযুক্ত বয়সে দুর্গাপ্রসন্নের উপনয়ন সংস্কার হয়। আচার্য দুর্গাপ্রসন্নের কানে বেদমন্ত্র প্রদান করলে তাঁর কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়। যুবক বয়সে একা কুমিল্লার মেহের কালীবাড়ি যান। মেহের কালীবাড়ির পঞ্চমুণ্ডী আসনে তিনি সাধনা করে জগজ্জননী, নৃমুণ্ডমালিনী, খড়্গাধারিণী, চতুর্ভুজা, হাস্যবদনা কালীমাতার দর্শন লাভ করেন।

দুর্গাপ্রসন্ন তাঁর গুরু নিগমানন্দজীর আদেশে তীর্থপর্যটনে বের হন। ভারতবর্ষের সকল তীর্থভ্রমণ করে তিনি হিমালয়ের উত্তরাখণ্ডে কয়েক বছর তপস্যা করেন।

দুর্গাপ্রসন্ন জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ, ভক্তিমার্গ— এই তিনপথে সাধন করে ব্রহ্মানুভূতি লাভ, পরমাত্মদর্শন এবং শ্রীশ্রী গিরিধারীর কৃপা লাভ করেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগ হয়। রাজাপুর তখন পূর্ব পাকিস্তানে। দুর্গাপ্রসন্ন তখন মানুষের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর রূপে প্রচারিত। কলকাতার ৬৩নং টালিগঞ্জ রোডে তখন তাঁর শ্রীগুরু সঙ্ঘ আশ্রম।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বরিশালে জেহাদিরা হিন্দুদের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার শুরু করে। হিন্দুরা প্রাণ ভয়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসে। ঠাকুর শ্রীশ্রী দুর্গাপ্রসন্নও গিরিধারীকে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় নলছিটি, স্ট্রিমারে খুলনা; অবশেষে রেলে কলকাতায় আসেন। পশ্চিমবঙ্গে এসে ঠাকুর শ্রীশ্রীদুর্গাপুসন্ন কাঁচরাপাড়ার দুই তিন মাইল উত্তরে পলাশীতে গিরিধারী আশ্রম করেন।

মানুষ মোহনিদ্রায় নিদ্রিত থাকে। সদ্‌গুরু মানুষকে জাগিয়ে দেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দুর্গাপ্রসন্নর তিরোভাব ৩০ শ্রাবণ, শনিবার ১৩৮২ বঙ্গাব্দ। ভগবান মানুষের মধ্যে মানুষের বেশে আসেন। তাঁর এই আসার ফলে মানুষের একটা নতুন দৃষ্টি উন্মোচিত হয়। মানুষ তার মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ দেখতে পায়।

অবতার সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'একরকম গাছ আছে জানো? ঠিক দেখতে গাছের মতো, ডালপালা ফুল-ফল সব হয়, কিন্তু সেটি কী গাছ তা কেউ জানে না। এইজন্য তার নাম অচিন। অবতার যখন আসেন তিনি ওই রকম অচিন গাছ হয়েই আসেন।'

পরিব্রাজকাচার্যবর শ্রীমদ্ দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেবের পবিত্র বাণী দ্বারা মানুষ এই দুর্দিনে নিজেকে চিনতে পারার প্রচেষ্টায় রত থাকুক এবং ক্রমান্বয়ে ভগবানকে চিনতে পারুক। ভাগবানকে চিনতে পারার সাধন-প্রচেষ্টায় মানুষের আত্মচৈতন্য জেগে উঠুক, আমিত্ব দূর হোক। মানুষ ভগবানের দেখা পাক এবং নিত্য-মুক্ত-জ্ঞান স্বরূপ হয়ে থাকুক। মুক্তিলাভের আনন্দে মানুষ মেতে উঠুক। আহা মুক্তির কী আনন্দ! আহা সত্যের কী আনন্দ! সমন্বিতভাবে মানুষ যেন এই আনন্দ ভাগ করে নিতে শেখে। জয় মানুষের মধ্যে মানুষ হয়ে আসা সেই অচিন গাছের জয়। ▮

জয়দেব মেলা মানেই বাউলগানের আসর

প্রদীপ ঘোষ

বীরভূমের এই মেলাকে ঘিরে মানুষের মধ্যে এক উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। এই মেলা মূলত বীরভূমের জয়দেব মেলা বা জয়দেব-কেন্দুলি মেলা বা বাউল মেলা নামে পরিচিত। বীরভূম জেলার সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যযুগীয় একজন প্রসিদ্ধ কবি পণ্ডিত জয়দেবের স্মৃতি তর্পণের উদ্দেশ্যে এই মেলা উদযাপিত হয়। প্রতি বছর পৌষ মাসের শেষে মকর সংক্রান্তির দিন পুণ্যস্নানের মাধ্যমে এই ঐতিহ্যবাহী মেলা শুরু হয়। এই গ্রামে জয়দেব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবের মূর্তির পুজো করা হয়ে থাকে এবং যে আসনে বসে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে মনে করা হয়, তা সংরক্ষণ করা রয়েছে।

জয়দেব কেন্দুলির নবরত্ন রাধাবিনোদ মন্দির মুঘল যুগে সেনপাহাড়ি পরগনার অন্তর্গত ছিল। ঔরঙ্গজেবের জারি করা একটি ফরমানের পর সপ্তদশ শতাব্দীতে এই পরগনা বর্ধমানের মহারাজা কৃষ্ণরাম রায়ের অধিকারভুক্ত হয়। এই গ্রামের যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায় বর্ধমান রাজদরবারের সভাকবি ছিলেন। মনে করা হয়ে থাকে, তাঁর অনুরোধে বর্ধমানের মহারানি ব্রজকিশোরী দেবী ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রামে জয়দেবের জন্মভিটেয় রাধাবিনোদ মন্দির স্থাপন করেন।

১৮৬০-এর দশকে নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রাধারমণ ব্রজবাসী এই গ্রামে তাদের কুলগুরু জয়দেবের জন্মভিটেয় নিম্বার্ক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাধাবল্লভ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। জয়দেব ছিলেন সংস্কৃত কাব্য গীতগোবিন্দের স্রষ্টা। বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর সূচনা জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদাবলী থেকেই বলে ধারণা করা হয়। কবি বা পণ্ডিত জয়দেব দ্বাদশ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য অনেকের মতে, ওড়িশার কেন্দুলি শাসন নামক একটি স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী। স্বয়ং জয়দেব লিখেছিলেন 'কেন্দবিল্ব সমুদ্র সম্ভব'। ওড়িশা ও দাক্ষিণাত্যে জয়দেবের প্রভাব অনস্বীকার্য।

জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাকবি বা পণ্ডিত ছিলেন বলে মনে করা হয়। সেকশুভদয়ায় একটি গল্প আছে লক্ষ্ম ণসেনের সভায় জয়দেবের আগমন নিয়ে। একদিন লক্ষ্ম ণসেনের সভায় এক বিখ্যাত সংগীতনিপুণ কলাবিদ এসে নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে জাহির করলেন। রাজা তার দাবি স্বীকার করে নিয়ে জয়পত্র লিখে দিতে চাইলেন। খবর পেয়ে জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী রাজসভায় এসে অনুরোধ করলেন তার স্বামীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে যেন তাকে জয়পত্র না দেওয়া হয়। রাজা সভায় জয়দেবকে আনলেন। তথাকথিত সংগীতনিপুণ কলাবিদের গানে গাছের সব পাতা ঝরে গেল। সবাই সংগীতনিপুণ কলাবিদকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। জয়দেব বললেন, এ আর এমন কী! গাছে আবার পাতা গজিয়ে দেখাও। সংগীতনিপুণ কলাবিদ অপারগতা প্রকাশ করলেন। তখন জয়দেব গান ধরলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে গাছের পাতা গজিয়ে উঠল। সকলে জয়দেবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করল। কবি জয়দেব বিষ্ণুর উপাসনা করতেন। কবি বা পণ্ডিত জয়দেব ছিলেন লক্ষ্ম ণসেনের (১১৭৮-১২০৬) রাজসভায় পঞ্চরত্নের অন্যতম। অপর চারজন হলেন গোবর্ধন আচার্য, শরণ, ধোয়ী ও উমাপতিধর। বর্তমানে বেশ কিছু মন্দির ও আশ্রম পরিবেষ্টিত এই গ্রামটি একটি ধর্মীয় তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর পৌষ মাসের শেষে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে এখানে বাউল মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যা আনুমানিক ৪০০ বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

অজয় নদে মকর সংক্রান্তির দিনে পুণ্যার্থীরা স্নান করেন। এই সময় নদীতে জল কম থকে। সেই কারণে প্রতিবছর পুলিশ ও প্রশাসন থেকে বালি তুলে জল জমানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে ডুব দেওয়ার জন্য পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা ঘাট বানানো হয়। এই মেলার পরিচালনা করেন মেলা কমিটি, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বীরভূম জেলার পুলিশ ও প্রশাসন। প্রতি বছরই এই সময়টার জন্য দিন গোনেন বাউলপ্রেমী মানুষজন। মকরস্নানের দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় সনাতন ধর্মের আধ্যাত্মিকতায় ভিত্তি করে গান-বাজনা, উৎসব।

জয়দেব মেলা মানেই বাউল গানের আসর। সেই সঙ্গে অবশ্যই কীর্তন। প্রতিবছর এই মেলায় তৈরি করা হয় কীর্তনীয়াদের জন্য কীর্তনের আখড়া এবং বাউলদের জন্য বাউলের আখড়া। প্রায় ৫০০টি আখড়া তৈরি করা হয় মেলাটিতে। মেলার পাশে রামপুর ফুটবল মাঠেও চলে মেলা। □

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

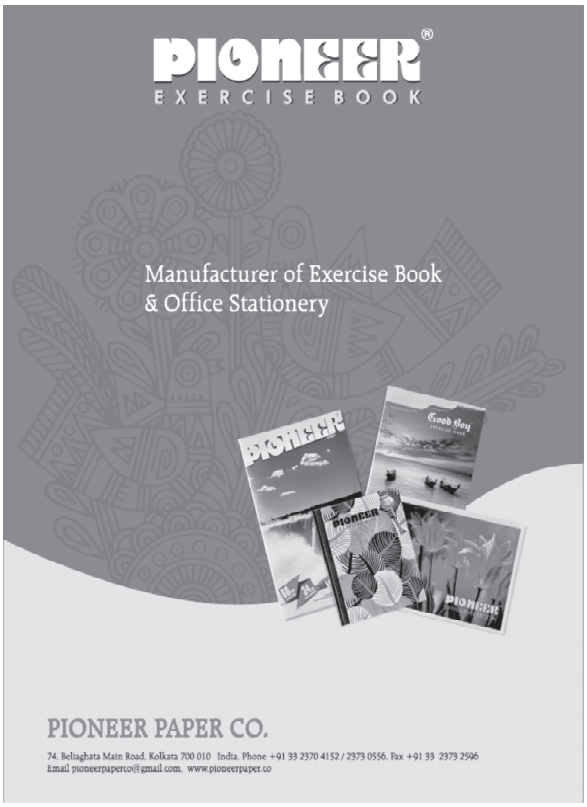

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

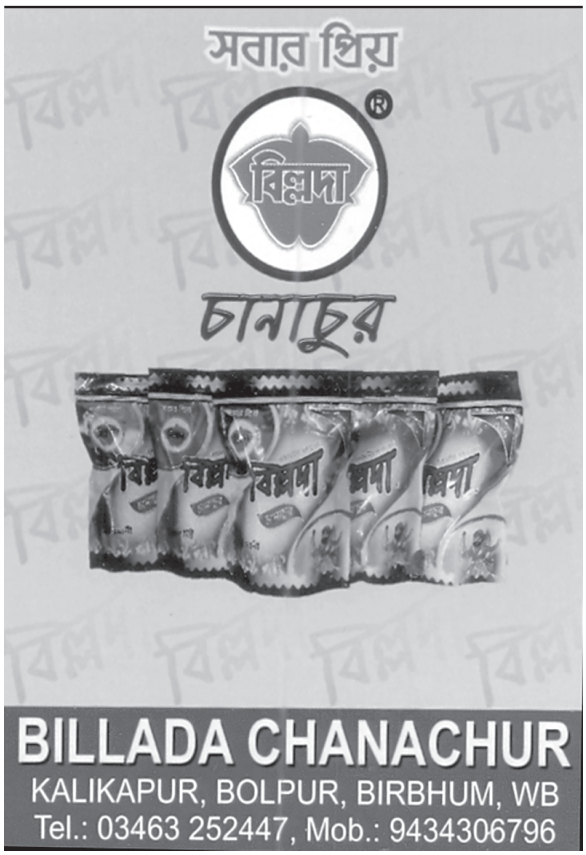

তৃণমূলি অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বিপন্ন

দেবযানী হালদার

ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ, পশ্চিমবঙ্গ যার একটি প্রদেশ। ভারতবর্ষের গণতন্ত্র এখন অত্যন্ত স্থিতিশীল। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র বিপন্ন কেন? এর উত্তর খোঁজার আগে প্রশ্ন হওয়া উচিত, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র কি আদৌ আছে? গণতন্ত্র অর্থাৎ সাধারণ নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনতন্ত্র এখানে কতটা বর্তমান? বর্তমান শাসকগোষ্ঠী তৃণমূল কংগ্রেস দশ বছর ক্ষমতায়। দশ বছর রাজত্বের ফল হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এখানে অবাধ সুষ্ঠ নির্বাচন হয় না। এখানে প্রশাসন বলতে সমান্তরাল দলীয় শাসনব্যবস্থা বোঝায়। দলের কর্মী থেকে পুলিশ, সবাই পার্টির ক্যাডার যারা প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করে। সর্বস্তরে দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার চরম অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে যেখানে নাগরিক সুরক্ষা অত্যন্ত অবহেলিত। খুন, জখম, ধর্ষণ, শিশু ও নারী পাচার, মাদকদ্রব্য পাচার, রাজনৈতিক হিংসা— সব দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম সারিতে। পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ যে ২০২০ সালের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর কাছে ২০১৯-এর অপরাধের তালিকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঠায়নি। অর্থাৎ পাঠালে তাদের মুখ রক্ষা দায় হয়ে উঠতো।

পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট হবার ইতিহাস বড়ো দীর্ঘ। এই রাজ্যের দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর বাম রাজত্বের ফল এক কথায় এই বিষময় পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। বিরোধীশূন্য উপত্যকা বাম রাজনীতির মূল কথা। গণতন্ত্রের বিরোধিতা বাম রাজনীতির আসল লক্ষ্য। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার নামে গণতান্ত্রিক সরকার বা রজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পৃথিবী জুড়ে। বিরোধী শূন্য করার নামে একটার পর একটা গণহত্যা হয়েছে সব দেশে যেখানেই কমিউনিস্ট সরকার ছিল। মিডিয়ার কণ্ঠ রুদ্ধ করা তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। এর ফলে গণহত্যা, দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত্যু ইত্যাদির প্রকৃত তথ্য সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি, তাদের জানতে দেওয়া হয়নি। মিডিয়াকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়। কাজেই গণতন্ত্র হত্যা তাদের ঐতিহ্য, তাদের কাছে চিরসত্য।

দুষ্কৃতি আক্রমণে রাজ্যক্ত ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহ। (ফাইল চিত্র)

বাম রাজনীতির মূল পশ্চিমবঙ্গের মাটির গভীরে প্রোথিত ছিল। তাই বামপন্থী নীতি অনুসরণ করে বর্তমানের অঘোষিত অতি বাম সরকারও বিরোধী শূন্য রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করার মরিয়া প্রচেষ্টা করেছে। যাতে বিরোধী দল পঞ্চায়েত ভোটে নমিনেশন জমা দিতে না পারে, শাসক দল সব ধরনের অসামাজিক, অনৈতিক, অগণতান্ত্রিক কাজে লিপ্ত হয়েছে। এই পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসার বলিতে দেশের মধ্যে অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

বঙ্গপ্রদেশের যুব সমাজ ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন করে দেশের স্বাধীনতা লাভে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। সেই পশ্চিমবঙ্গে শাসকশ্রেণী এখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তোষামোদ করেছে নির্লজ্জ ভাবে। আর তার বিনিময়ে শাসকগোষ্ঠী পেয়েছে গুন্ডা, মাফিয়া, সিন্ডিকেট রাজ। ভোটার তালিকা তৈরি হয়েছে অনুপ্রবেশেকারীদের নিয়ে। এক পক্ষের ভোট চাই টিকে থাকতে, অপর পক্ষের এদেশে থাকার বৈধ কাগজ চাই যাতে এখানে অপরাধের স্বর্গরাজ্য তৈরি করা যায়, যাতে এদেশের জনবিন্যাসের চরিত্র বদলে দেওয়া যায়, যাতে পশ্চিমবঙ্গকে দেশের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। ভোটের লোভে দেশের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে আপোশ করতেও পিছপা হয়নি তারা। বারবার দাঙ্গা বেঁধেছে, অথচ প্রশাসন নীরব থেকেছে, কঠোর হাতে দমন হয়নি। গণতন্ত্র বারবার মহাকরণের কানাগলিতে ডুকরে কেঁদেছে, কিন্তু সমাধান হয়নি।

আমাদের সংবিধানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশ, তার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রদান। মৌলিক অধিকার বলতে ধর্মাচরণের অধিকারকেও বোঝায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা যেখানে পাঁচ বার নামাজ পড়লে শব্দদূষণ হয় না, ইংরেজি নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাজি ফাটলে যখন বায়ুদূষণ হয় না। 'জয় শ্রীরাম' এখানে গালাগালি বলে প্রচার করা হয়। গণতন্ত্র তখন কোথায় থাকে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিজয়াদশমী পালন করতে পারে না, হাইকোর্টের দরজায় করাঘাত করতে হয়, বিসর্জনের শোভাযাত্রা বন্ধ হয়ে যায়, দেওয়ালীর বাজি বন্ধ করে দেওয়া হয়, শ্রীরামের নাম নিলে হাজতবাসের ভয় দেখানো হয়? যেখানে ভোটের ফলাফল পরিবর্তন করার জন্য দেদার অনুপ্রবেশের অনুমোদন দেওয়া হয়, সেখানে গণতন্ত্র ভীষণ ভাবে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অপমানিত। আসলে ক্ষমতা হারানোর ভয় যাদের থাকে তাদেরই ক্ষমতার অপব্যবহার চরম সীমায় পৌঁছে যায়। তারা যেনতেন প্রকারে ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়। গণতন্ত্র রক্ষার দায় তাদের কেন থাকবে? কিন্তু কথায় আছে, 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়'। পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র আজ যে স্থিতিতেই থাক, তাকে ফিরিয়ে আনার দায়ভার সাধারণ মানুষের কাঁধে। পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ফিরিয়ে আনতেই হবে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে, সংবিধানের স্বার্থে। ■

ফ ঃ ৫

একুশের নির্বাচনে প্রধান ইস্যু উন্নয়ন

সুকল্প চৌধুরী

করোনা ভাইরাস ডিজিস বা কোভিড আতঙ্ক কাটিয়ে দেশ এখন অনেকটাই ছন্দে ফেরার পথে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোভিশিল্ড মানুষের নাগালের ভেতর এসে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই করোনা প্রতিষেধক এই ভ্যাকসিন প্রদানের প্রথম ধাপ দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। এমনই আবহে পশ্চিমবঙ্গ-সহ মোট পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আর মাস চারেকের ভেতর।

যারা রাজনীতি, অর্থনীতি বা সমাজনীতি নিয়ে সামান্যতম ভাবনায় আছেন তাঁদের কাছে তো বটেই সাধারণ মানুষও এই রাজ্যের আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে অসীম গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। স্বাধীনতার পর থেকে সরকার পরিবর্তনের নির্বাচন হয়েছে ১৯৬৯, ১৯৭৭ এবং ২০১১ সালে। এই নির্বাচনগুলি হয়েছে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, শাসক দলের অত্যাচার অবিচার— এইসব বিষয়কে সামনে রেখে। অন্যান্য যে বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছিল তার মধ্যে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ অন্যতম। শ্রমিক, কৃষক থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সকলেই ভেতরের তাগিদ থেকে এই তিনবার সরকার পরিবর্তন চেয়ে ব্যালটে ছাপ দিয়েছেন। এখানে বলতেই হয় এক সময় এই রাজ্যে বামেদের প্রতি জনসমর্থন ছিল। বিশেষকরে ওপার বাংলা থেকে অত্যাচারিত ও বিতাড়িত সব হারানো ছিন্নমূল মানুষ মনে করতেন তথাকথিত সর্বহারার দল বামেরা তাঁদের সহায়তা দেবে। তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে ১৯৬৯ ও ১৯৭৭ সালে। যদিও পরে প্রমাণিত হয়েছে এই সমর্থন ছিল ভুল। জরুরি অবস্থার পর ১৯৭৭ সালের বিধানসভা ভোটে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে সিপিএমকে সামনে রেখে বামেরা ক্ষমতায় আসে। কিন্তু হাজার হাজার মানুষের হত্যাকারী ও নির্বাসনে পাঠানো স্ট্যালিন এবং মাও আদর্শে অনুপ্রাণিত সিপিএম তাদের বিরোধী মত পোষণকারী তো বটেই দলের নিরিখে যারা সংশোধনবাদী সেইসব সাধারণ মানুষের উপর এতটাই অত্যাচার শুরু করে যে ২০১১ সালে আর কোনো উপায় না পেয়ে বিকল্প হিসেবে ভোটদাতারা তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করে। ২০১৬ সালে বাম ও কংগ্রেস জোট বাঁধলেও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে পারেননি অধীর চৌধুরী বা সুর্যকান্ত মিশ্র। ফলে ফের ক্ষমতায় আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানতেই হবে এই সময় পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টি গোটা রাজ্যে সাংগঠনিক ভাবে পায়ের নীচে মাটি শক্ত করলেও রাজ্যশাসনের মতো ভিত গড়তে পারেনি। যদিও প্রায় সব আসনে দ্বিতীয়স্থানে ছিল বিজেপি। এই সময় থেকে উল্কার গতিতে দলের উত্থান শুরুও হয়েছিল। তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে পরে লোকসভা নির্বাচনে।

মানুষ নিজের স্বার্থে এবারেও প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট দেবেন। পাশাপাশি শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান এই দুই ভাবনাকে সামনে রেখে এবারের নির্বাচন হতে চলেছে এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। মাননীয়ার মুখবাণী 'সব করে দিয়েছি'-এর পাশাপাশি তোলাবাজি, স্বজন পোষণ, দুর্নীতি এই সবের বিরুদ্ধে এবারের ভোট হবে।

বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই পূর্ণ শক্তি নিয়ে ময়দানে নেমেছে বিজেপি। রাজ্যের শাসকদলের প্রতি আস্থা হারিয়ে বিগত লোকসভা নির্বাচনে ইভিএম মেশিনে বোতাম টিপে দিল্লিতে বিজেপি দলের ১৮ জন প্রার্থীকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। পাঁচটি কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে বামেরা ভোট কাটার ফলে সামান্য ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েন বিজেপি প্রার্থীরা। যদিও এখন এই রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ ১৯ জন। এক কথায় বিজেপি এখন এই রাজ্যে পরীক্ষিত প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণতন্ত্রকে হত্যা করে বিরোধীদের বেশিরভাগ জায়গাতে প্রার্থী দিতে দেয়নি রাজ্যের শাসক দলের দুষ্কৃতীরা। তারপরেও যেখানে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পেরেছে সেখানেই মানুষ তাঁদের সমর্থন জানিয়েছেন। গায়ের জোরে এবং রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে কোনও একনায়কই চিরদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি, ইতিহাস তার সাক্ষী। বিরোধী দলের নেতারা মনে করেন লুম্পেন, অনুপ্রবেশকারী, গোরু-কয়লা-বালি পাচারকারীদের সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসনে বিরক্ত রাজ্যের মানুষ এখন আন্তরিক ভাবেই পরিবর্তন চাইছেন। এই পরিবর্তন কেবলমাত্র উন্নয়ন ও শান্তিতে বসবাসের স্বার্থে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন ক্রমহ্রাসমান তৃণমূল কংগ্রেস, হারিয়ে যাওয়া জাতীয় কংগ্রেস, ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেওয়া সিপিএম তথা বামেরা মিলিতভাবে বিজেপির বিকল্প হয়ে উঠতে পারছে না।

স্বাধীনতার পর বিগত ৭৫ বছরের ভেতর এই রাজ্যে এবারের বিধানসভা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেন তার অনেকগুলি কারণ আছে বলে মনে করছেন রাজ্যবাসী। অতীত সময়ে কংগ্রেসের এবং পরবর্তীকালে বামেদের শাসনের দিনগুলিতে বাঙ্গলার গড়পড়তা মানুষের আয় নিম্নসীমার মধ্যেই ছিল। গ্রামবাঙ্গলায় ধানের উপর লেভি, ঢেকি লোন

আর অতি সাধারণ মানের জীবনযাপনে অভ্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ গোটা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল না। নব্বইয়ের দশকের শেষের সময় তেকে অগ্রগতির স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। বিশেষকরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলজীর পুবে তাকাও নীতির ফলে এক ঝটকায় রাজ্যবাসীর চোখ খুলে যায়। একটা সময় পশ্চিমবঙ্গে অতিবাম নকশালের শ্রেণীশত্রু দমনের নামে খুনের ভয়াবহ রাজনীতি, কংগ্রেসিদের গুন্ডামি, বামেদের সুচারু ভাবে চুরি, দুর্নীতি, সমাজের উপর জোর করে স্থানীয় দলীয় নেতাদের আধিপত্য বিস্তার, কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট, শিল্প কারখানা বন্ধ সব মিলিয়ে মানুষ দমবন্ধ-করা অবস্থায় ছিলেন।

শেষ তিনবার সায়েন্টিফিক রিগিং, প্রশাসনকে কুক্ষিগত করে বামেরা ক্ষমতায় থাকার পর মানুষ সম্পূর্ণ ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। ২০১১ সালে বিপুল জন সমর্থন পেয়ে তৃণমূলকংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। হরেক প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিকে মানুষ বিশ্বাস করেছিলেন। মমতার আন্দোলনের প্রতীক সিঙ্গুরের মতো গোটা রাজ্য শিল্পের মরুভূমি। এখন পশ্চিমবঙ্গ নেই রাজ্য। শিক্ষায় পিছিয়ে, জনগণের টাকা খরচ করে শিল্পপতিদের নিয়ে বছর বছর সম্মেলন হলেও শিল্প আসে না। এই তথাকথিত শিল্পপতিদের সম্মেলনে কত টাকা খরচ হয়েছে এবং সম্মেলনের ইভেন্ট ম্যানেজার কে ছিল তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের রাজ্যপাল। রাজ্যের মানুষ দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী পার্ষদদের নিয়ে শিল্পসন্ধানে বিদেশে গেলেও গালভরা বুলি ও ফাঁকা ঝুলি নিয়ে ফিরে আসেন। মুখ্যমনন্ত্রীর স্বপ্নে ভাসে শিল্প কারখানার জন্য ল্যান্ডব্যাঙ্ক। প্রকৃতভাবে কারখানা গড়তে চাইলে শাসক দলের আশ্রিত মাফিয়াদের কাছ থেকে জমি কিনতে হবে। সেই মাফিয়াদের ঠিক করে দেওয়া সিন্ডিকেটের কাছ থেকে নিম্নমানের ইমারতি জিনিস বেশি দামে কিনতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প গড়তে কোনও সরকারি সুবিধা মিলবে না। যা গুজরাট-সহ প্রায় সব রাজ্যেই আছে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বামেদের ভুল পথে চালিত শ্রমিক আন্দোলনের ফলে একে একে শিল্প কারখানা বন্ধ হতে থাকে এই রাজ্যে। বামেদের শাসনে কারখানার দেউটি নিভে যায়। এই সরকার বিগত দশ বছরে শিল্প কারখানা গড়ার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ফলে কর্মসংস্থানের পথ প্রায় অবরুদ্ধ। এই অবস্থায় রাজ্যে বেকারি বাড়ছে। নতুন কোনো কর্মসংস্থান নেই। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডক্টর মানস দাশগুপ্ত মনে করতেন, কর্মসংস্থান নেই তাই এই রাজ্যের শ্রমসম্পদ পরিযায়ী হয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। পাশাপাশি গোটা রাজ্যের ছোটোবড়ো প্রতিটি জনপদের পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠছে ছোটোখাটো দোকান। চাল, ডাল থেকে শুরু করে জামাকাপড়, পান সিগারেট-সহ তামাকজাত নেশার জিনিস, ফোটোকপি মেশিন, ল্যামিনেশন মেশিন, তরিতরকারি, দুধ সবই হাতের কাছে। বাম মনোভাবা সম্পন্ন অধ্যাপক দাশগুপ্তের মতে রাস্তা পাকা করা বা নিকাশী নালা পরিষ্কার করা অথবা ঝকঝকে পথ বাতি দিলেই উন্নয়ন হয় না। এছাড়া, মানুষকে সাময়িক দানখয়রাতি দিলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্থায়ী সমাধান হয় না। লোক দেখানো এসব করে ইভিএমে সাফল্য মিলতে পারে কিন্তু মানুষ সেই তিমিরেই থেকে যায়। এই কারণেই পাড়ায় হাজার দোকান দিলেও সহজে ক্রেতা মেলে না। আয়ের পথ না থাকলে মানুষের পক্ষে একান্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া আর বিশেষ কিছুই কেনা সম্ভব হয় না। নির্দিষ্ট মাসমাইনের সরকারি কর্মচারি ও কিছু সফল ব্যবসায়ীর বিলাস সামগ্রী কেনা দিয়ে অর্থনীতির সাফল্য বিচার করা যায় না বলেই অর্থনীতির অধ্যাপকরা মনে করেন। শাসক দলের পদ আঁকড়ে সরকারি তহবিলের নয়ছয় করা বা তোলাবাজি-সহ গোরু, বালি, কয়লা পাচার করে এবং টাকার বিনিময়ে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ব্যক্তি জীবনে 'পয়সাওয়ালা' হওয়া যায় কিন্তু রাজ্য অর্থনীতিতে তার ছাপ পড়ে না।

নির্বাচন কমিশনের হিসেব অনুসারে এই রাজ্যে নতুন ভোটার বেড়েছে প্রায় ২৩ শতাংশ। তাঁদের ভেতর একটা বিরাট অংশ কম করেও মাধ্যমিক পাশ। ইন্টারনেটে সচ্ছন্দ এবং ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার নির্ভর এই ভোটারদের স্বচ্ছ দৃষ্টি আছে। ফলে তাঁরা স্রোতে গা ভাসাবেন না বলেই অভিমত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। এই রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে ২০ থেকে ৩৫ বছর বয়েসি যারা লেখাপড়া শিখেও উপযুক্ত রোজগার করার পথ পাচ্ছেন না, যারা বাধ্য হয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হয়েছেন বা যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করছেন না তারাও রাজ্যসরকারের উপর ক্ষুব্ধ। প্রশ্ন উঠেছে যারা এসএসসি পাশ করে নিয়োগের দাবিতে রাস্তায় বসছেন বা চাকরির পরীক্ষা দিয়েও ফল বের হওয়ার আশায় অনেক বছর কাটিয়েছেন তাদের ক্ষোভ কীভাবে প্রশমিত হবে? অনেক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীর স্বজন অথবা ৭ থেকে ৮ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে ৫৪ থেকে ৬৯ নম্বর পেয়ে বিএড ছাড়াই অনেকে আপার প্রাইমারিতে শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছেন। অথচ এর থেকে অনেক বেশি নম্বর পেয়েও বহু প্রার্থী নিয়োগপত্র পাননি। আদালতের নির্দেশে আপার প্রাইমারিতে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করলেও তৃণমূলি নেতাদের, ব্যর্থ শিক্ষামন্ত্রীর এবং অবশ্যই সবার উপরে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের হস্তক্ষেপে নিয়োগ প্রক্রিয়া কতদূর স্বচ্ছ হবে প্রশ্ন উঠছে চাকরিপ্রার্থীদের ভেতর।

অলীক স্বপ্নের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, সাইকেল পিছু ৪০০ টাকা করে কাটমানি রাখা, সবুজসাথী বা মেলা-খেলায় সরকারি টাকা নয়ছয় অথবা হরেক কিসিমের প্রকল্পের নামে জনগণের পকেট কাটা আর কতদিন চলবে এমনই প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ। এই রাজ্যে জাতের নামে রাজনীতি কোনোদিন ছিল না। পাহাড়-সমতলে জাতিগত উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে ভেদাভেদের রাজনীতির আমদানি হয়েছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন। কোচবিহার জলপাইগুড়িবাসী রাজবংশী ও কামতাপুরী যে আলাদা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে না দিলে জানতেন না। আসলে এইসব উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে যে ভোটের নামে সরকারি টাকা ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে কথা সবাই বোঝেন। যেমন ক্লাব উন্নয়নের নামে গুন্ডা পোষা হচ্ছে।

তবে যাই হোক না কেন, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে মানুষ নিজের স্বার্থে এবারেও প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট দেবেন। পাশাপাশি শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান এই দুই ভাবনাকে সামনে রেখে এবারের নির্বাচন হতে চলেছে এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। মাননীয়ার মুখবাণী 'সব করে দিয়েছি'-এর পাশাপাশি তোলাবাজি, স্বজন পোষণ, দুর্নীতি এই সবের বিরুদ্ধে এবারের ভোট হবে।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :-

ASHOKA TOOLS PVT. LTD.

MECHANICAL & STRUCTURAL ENGINEERS

email : ashokatools@hotmail.com

-: REGD. OFFICE :-

23A, Netaji Subhas Road,

11 th Floor, Room No. 31,

Kolkata-700 001

Phone No. 9331229004

-: FACTORY :-

Santra para, Par Dankuni

Hooghly, Pin- 712310

PHONE : OFFICE : 2231-9166/

PH. 9903853534

With the best Compliments from :

JALAN CHEMICAL & INDUSTRIES PVT. LTD.

Director : Rajesh Jain

27AB Royd Street, Ground Floor

Kolkata-700016

Phone : 22297263

কোচ ফাউলার এত সাহস পেলেন কোথায়?

কল্যাণ চৌবে

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল যে যুগ যুগ ধরে এত সাফল্য এনেছে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে, এটা কি পুরোটাই বিদেশিদের অব দান? এই সাফল্যে দেশীয় ফুটবলারদের কি কোন ভূমিকা নেই?

শুরুতেই এই দুটো প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে কারণ, ইস্টবেঙ্গলের ব্রিটিশ কোচ রবি ফাউলার অত্যন্ত অসম্মানজনক কথা বলেছেন ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়ে। ইস্টবেঙ্গল এবার আইএসএলে একদমই ভালো খেলতে পারছে না। এর কারণ হিসেবে কোচ ফাউলার ভারতীয় ফুটবলারদের খারাপ পারফরম্যান্সকে দায়ী করেছেন। বলে দিয়েছেন, এই টিমের ভারতীয় ফুটবলারদের দেখে মনে হচ্ছে, এরা কোনওদিন ভালো কোচিং পায়নি!

এর অর্থ, ফাউলার আমাদের দেশের ভারতীয় কোচেদেরও অপমান করলেন! ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস-ঐতিহ্য-গৌরব না জেনে একজন বিদেশি কোচের এই ধরনের মন্তব্য কাম্য নয়।

লম্বা ফুটবল কেরিয়ারে বহু বিদেশি কোচ যেমন জিরি পেসেক, আক্রামভ, স্টিফেন কনস্টানটাইন, ডেভিড বুথ থেকে করিম বেঞ্চারিফা আবার ভারতীয় কোচ পি কে ব্যানার্জী, অমল দত্ত, হাবিব, নইমুদ্দিন, সুখবিন্দর সিংহ থেকে স্যাভিও মিদেরা প্রত্যেকের প্রশিক্ষণে খেলার অভিজ্ঞতা

আমার রয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি একটা জাতিকে (ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়দের) কোনো প্রশিক্ষক যদি সামগ্রিক ভাবে অযোগ্য বলেন তা অত্যন্ত নিন্দাজনক।

আমি বরং কোচ ফাউলারকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনি বড়ো ফুটবলার ছিলেন কিন্তু মাঠের বাইরে আপনার অনুশাসনহীন জীবনযাত্রা নিয়ে অনেক সমালোচনা রয়েছে। একজন খেলোয়াড় বা প্রশিক্ষকগোটা সমাজের কাছে আদর্শ। তাদের দেখে তরুণ প্রজন্ম এগিয়ে আসবে। সেখানে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে শব্দ চয়নে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

এবার আসি কোচিংয়ের কথায়। কোচ হিসেবে আপনি মুনাংথং ইউনাইটেড এফসি নামের একটি অনামী ক্লাবে কোচিং করিয়েছেন। তাও সেই ২০১১-১২ সালে। সেখানে কোনও সাফল্য নেই। তারপর কোচিংয়ের ক্ষেত্রে কর্মহীন ছিলেন সাত-আট বছর। শেষে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন রোয়ারে

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল যে যুগ যুগ ধরে এত সাফল্য এনেছে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে, এটা কি পুরোটাই বিদেশিদের অবদান? এই সাফল্যে দেশীয় ফুটবলারদের কি কোন ভূমিকা নেই?

কোচিংয়ের সুযোগ পান। সেখানেও ব্যর্থ। এক বছরেই বিদায়। সেই আপনাকেই ঘটা করে নিয়ে এসেছে এসসি ইস্টবেঙ্গল। এখানে এসেই চরম ব্যর্থ। একের পর এক হার। জঘন্য কোচিং স্ট্র্যাটেজি। তারপরেও কি না আপনি দুষছেন ভারতীয় ফুটবলারদের!

বিদেশি ফুটবলারদের তো টিমে আপনি বাছাই করে এনেছেন। তাঁদের পারফরম্যান্সটা কী একটু বলবেন? আপনি বলছেন, ভারতীয় ফুটবলাররা কোথায় দাঁড়াতে হবে সেটাই না কি জানে না! কিন্তু কোচের কি এটাই কাজ নয় যে খেলোয়াড়কে কোথায় দাঁড়াবে, রক্ষণ বা আক্রমণে তাদের ভূমিকা কি হবে তা ঠিক করে দেওয়া।

শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ভারতীয় ফুটবলকে বিভিন্ন সময় গৌরবান্বিত করেছে। যদিও এবছর তারা শেষ দল হিসেবে আইএসএলে সংযুক্ত হয়েছে তবুও আমি মনে করি এই ইস্টবেঙ্গলকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে কিন্তু দেশীয় ফুটবলারদেরই জেগে উঠতে হবে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এই ক্লাবটা নিয়ে বাঙ্গালি তথা ভারতীয়দের মধ্যে যা আবেগ কাজ করে, তার গুরুত্ব বিদেশিরা বুঝতে পারবেন না। লাল-হলুদ রঙটাই জাগিয়ে তোলে একটা গোটা সমাজকে। আপনি কর্মসূত্রে যে দেশে এসেছেন সেই দেশের খেলোয়াড়দের যদি সম্মান না করেন তাহলে আপনি কীভাবে সম্মান পাবেন? □

প্রকৃতি প্রেম

একটি গাছ একটি প্রাণ

রাতুল সবসময় মন ভুলানো ভালোবাসায় ডুবে থাকতে চায়। বন্ধু-বান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী, জীবজন্তু, গাছপালা সবাই যেন রাতুলের আপন জন। শিশুমনের যে অনাবিল আনন্দ তা দিয়ে সবাইকে আনন্দে মাতিয়ে রাখতে চায়। আবার কখনো সাগরে

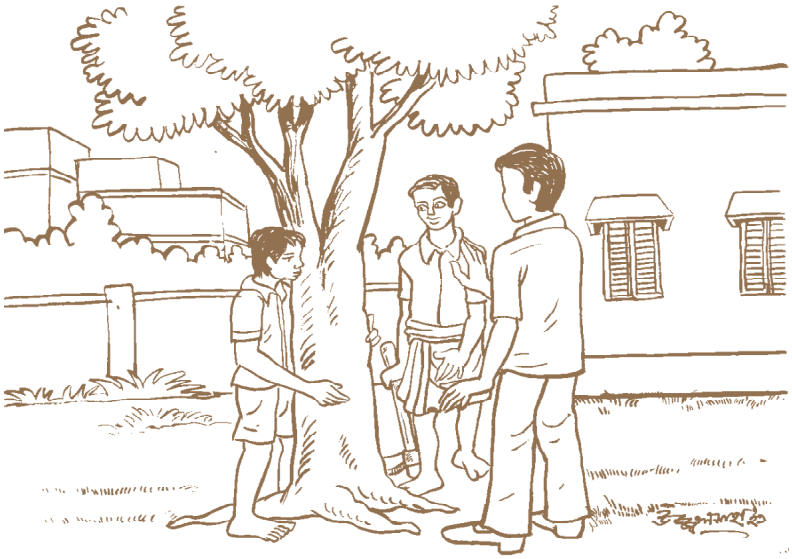

ভাসতে ইচ্ছা করে। দুইয়ের মাঝখানে এগিয়ে চলেছে রাতুলের জীবন। গ্রামবাঙ্গলার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধ রাতুলকে। ছোটো রাতুলের চোখে অনেক স্বপ্ন। ভবিষ্যতের জন্য এই সুন্দর পৃথিবীকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায় সেই চিন্তাও করে সে।

অন্যান্য দিনের মতো আজও সকাল দশটায় স্কুলে গেল রাতুল। যেতে যেতে রাস্তার পাশে প্রাকৃতিক নানান দৃশ্য দেখে সে মোহিত হয়ে পড়ে। স্কুলে যাবার পথে সে ধীর পায়ে এগোতে থাকে। রাস্তার দু'পাশে দেবদারু গাছের সারি, কৃষ্ণচূড়াগাছের ফুল দেখতে দেখতে স্কুলে পৌঁছে যায় আর ভাবতে থাকে এমন দেশটি বিশ্বের আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। এমন দেশে জন্ম নিয়ে সে ধন্য।

বিকেলে ছুটির পর বাড়ি ফিরে আসে রাতুল। উঠোনের মাঝখানে বাবার সঙ্গে দুজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাতুলের মন খারাপ হয়ে গেল। তার মনে হচ্ছিল খারাপ কিছু একটা ঘটতে চলেছে। একটু পরেই সে বুঝতে পারল যা ভেবেছে ঠিক তাই। বাবা সেই সর্বনাশের কাজটাই করতে যাচ্ছেন। তাদের বাড়ির উঠোনের পাশে যে বড়ো আমগাছটা আছে সেটা বিক্রি করে দেওয়ার কথা চলছে। তাও আবার পাঁচশো টাকায়। রাতুল স্কুলব্যাগটা ফেলে, ছুটে গিয়ে আমগাছটাকে জড়িয়ে ধরল। বাবাকে বলল, আমি এ গাছ কাটতে দেব না। এ গাছ আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। বাবা, তুমি টাকা ফিরিয়ে দাও। বাবা বললেন, আমার টাকার বিশেষ দরকার, তাই গাছটা বিক্রি করে দিচ্ছি। রাতুল কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমাদের তো অনেক মোরগ রয়েছে। তার থেকে একটা বিক্রি করলেই তো পাঁচশো টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমগাছটা আমি কিছুতেই কাটতে দেব না।' সে বাবাকে বুঝিয়ে বলল, 'আমাদের এই গাছে কত সুস্বাদু আম হয়। এই ফলে কত পুষ্টি গুণ আছে। গরমে ছায়া দেয়। আর সবচেয়ে বড়ো কথা এর থেকে আমরা শুদ্ধ অক্সিজেন পাচ্ছি। নানাভাবে গাছটি আমাদের উপকার করছে। এতে আমরা বেঁচে আছি।'

ছেলের মুখে এমন কথা শোনার পর রাতুলের বাবা টাকা ফিরিয়ে দিলেন। যারা গাছ কিনতে এসেছিল তারা ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গেল। ছেলের কথাগুলো মন দিয়ে ভাবলেন রাতুলের বাবা। তাঁর মনে হলো ছেলে কথাগুলো তো মন্দ বলেনি। গাছ হলো আমাদের প্রাণ। তাকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য। এ দায়িত্ব আমাদের সকলের।

খুশিতে ভরে উঠল রাতুলের মন। মনে মনে বলল , একটা গাছের তো প্রাণ বাঁচানো গেল। সবাই যদি এরকম ভাবে তাহলে কিছুটা হলেও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা হয়। তারফলে প্রকৃতিক বিপর্যয় কমবে এবং ভয়ানক দুর্যোগের প্রকাপ থেকে রক্ষা পাবে প্রাণীজগৎ। বাবাকে বোঝাতে পেরেছে বলে রাতুলের মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে। বাবার প্রতি শ্রদ্ধায় তার মাথা নত হয়ে আসছে। বাবার মতো পাড়াপ্রতিশীর মনে চেতনার দীপ জ্বালানোর প্রতিজ্ঞা নিয়েছে সে।

রাতুল বয়সে ছোটো হলেও বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী ও শিক্ষক মহাশয়দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে। তার সচেতন মনোভাবের জন্য সবাই তাকে ভালোবাসে, স্নেহ করে। রাতুলও বুঝতে পারে, ভালোবাসা ও সততার দ্বারা অনেক দুর্গম পথ বেয়ে মহতী জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়া যায়। অতিক্রম করা যায় অনেক কণ্টকাকীর্ণ পথ।

যখন আকাশ জুড়ে মেঘগর্জন শুরু হয় তখন রাতুল বুঝতে পারে বর্ষার আর দেরি নাই। বৃষ্টি শুরু হলে গাছগাছালি বাতাসে দোলা দিতে থাকে, তখন রাতুলের মন আনন্দে নেচে ওঠে। সে দেখতে পায় সেজে উঠছে প্রকৃতি, মাঠ সবুজ ধানে ভরে উঠছে, ফলে-ফুলে ভরে উঠছে দেশ। সঙ্গে সঙ্গে রাতুলের মনও সুচিন্তা আর দায়িত্ববোধে ভরে ওঠে।

দুলাল চন্দ্র শীল

ভারতের পথে পথে

কাংড়া

মাণ্ডী থেকে উত্তর-পূর্বে পাঠানকোট শহরের অদূরে শাহাপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছবির মতো প্রাকৃতিক উপত্যকা কাংড়া। সবুজে ঘেরা ওক পাইন ও ফলের খেত। তার মাঝে অসংখ্য পাহাড়ি নদী, ঝোরা, নালার জলকল্লোল। বয়ে চলেছে বড়ো নদী বৈদিক কালের বাণগঙ্গা। শিবালিক পর্বতের পাদদেশে৪৫০ মিটার উঁচু কাংড়ার উত্তর জুড়ে ধৌলাধার পর্বতশ্রেণী। পাহাড়ি শৈলীর কাংড়া পেইন্টিং পর্যটকদের আকর্ষণ করে। ছবির মুখ্য উপজীব্য বিষয় রাধা-কৃষ্ণের পৌরাণিক আখ্যান। কাংড়া দুর্গের ধ্বংসাবশেষও পর্যটকদের আর এক দ্রষ্টব্য। রয়েছে ব্রজেশ্বরীমাতার মন্দির ও ভবন। মন্দিরের পেছনে শ্বেতশুভ্র ধৌলাধার।

জানো কি?

- অক্টোপাসের দেহে তিনটি হৃদপিণ্ড আছে।
- চিংড়ি শুধু পিছনের দিকে সাঁতার দিতে পারে।
- পিঁপড়ার ঘ্রাণশক্তি কুকুরের চেয়ে বেশি।
- কচ্ছপ পায়ু দিয়েও নিঃশ্বাস নিতে পারে।
- শামুক পা দিয়ে নিঃশ্বাস নেয়, নাক চারটি।
- মৌমাছির চোখ পাঁচটি।
- ফড়িঙের কান হাঁটুতে।
- প্রজাপতির চোখের সংখ্যা ১২ হাজার।

ভালো কথা

লকডাউনে অনেক কাজ

প্রথম যেদিন লকডাউন শুরু হয় খুব খারাপ লেগেছিল। ভাবছিলাম সময় কাটবে কী করে। তারপর কোথা দিয়ে যে এতগুলি মাস পেরিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে একঘণ্টা আসন-ব্যায়াম। তারপর কাড়া খেয়ে একঘণ্টা সারা বাড়ি সবাই মিলে সাবানজল দিয়ে ধোয়া। স্নান সেরে জলখাবার খেয়ে অনলাইন ক্লাস। দুপুরে খাবার পর পুরনো দিনের মুভি দেখা। সন্ধ্যার আগে আবার একঘণ্টা আসন-ব্যায়াম। সন্ধ্যায় সবাই মিলে আড্ডা। ন'টা থেকে দশটা পড়াশোনা। সাড়ে দশটায় রাতের খাবার। আমরা কিন্তু এখনো আমাদের এই কর্মসূচি বজায় রেখেছি। লকডাউনে মা খুব খুশি, কেননা মায়ের কাজ আমরা সবাই ভাগ করে নিয়েছি।

বিপাশা দাস, দ্বাদশ শ্রেণী, মানবাজার পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) বা ত্তি ধা বি	(১) ভা ব ল রা ফ ত ন
(২) ব গ ক তি	(২) তি ক্ত রি প্র জ য়ো না

১১ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) আলকাতরা (২) অধিনায়ক

১১ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) বসন্তকালীন (২) ভুবনমোহন

উত্তরদাতার নাম

(১) সুনার বসু, টি পি রোড, কলকাতা-৬। (২) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃদিঃ। (৩) আকাশ বাসফোর, খরমুজাঘাট, রায়গঞ্জ, উঃদিঃ। (৪) শুভম দাস, গোবরডাঙ্গা, উঃ ২৪ পঃ

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ৩০।।

মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর অর্থাৎ শ্রীগুরুজীকে ডাক্তারজী নিজের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করলেন।

১৯৪০ সাল। সকাল ৯টা ২৭ মিনিটে ডাক্তারজীর জীবনদীপ নির্বাপিত হলো।

শোকার্তরা দলে দলে ঘটাটেজীর বাংলোয় ভিড় করতে লাগলেন। বিকাল ৫টায় বিশাল শোকযাত্রা বের হলো। সব পক্ষের ছোট-বড়ো নেতারা এই অজাতশত্রু মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা জানালেন। ফুল-মালা থেকে যিনি সবসময় দূরে থাকতেন, তাঁর দেহ ফুল-মালায় ঢেকে গেল। ভেঙে পড়ল অপার জনসমুদ্র।

রেশিমবাগ ময়দান তাঁর কর্মভূমি ছিল। সেখানেই দাহক্রিয়া সম্পন্ন হলো। অগ্নিময় শরীর আগুনে ভস্মীভূত হলো।

নাগপুর রেশিমবাগ ময়দানের ওই স্থানেই স্মারক তৈরি হয়েছে। তারই সামনে উপস্থিত হয়ে আজ হাজার হাজার স্বয়ংসেবক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন ও নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হন।

দেশরক্ষায় সাধুসন্তের ভূমিকা অপরিসীম

গিরিজাশঙ্কর দাস

ইংরেজিতে একটি কথা আছে— 'হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ'--- ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি করে। ভারতবর্ষ তথা হিন্দুধর্মের ইতিহাস হয়তো বা সহস্র সহস্র অথবা লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ এস জে মার্শালের মতে, হিন্দুধর্মের নিদর্শন প্রাচীন প্রস্তর যুগের সময় থেকেই পাওয়া যায়। বস্তুত হিন্দুধর্ম বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্ম এবং এর থেকেই ক্রমে ক্রমে উৎপত্তি বৌদ্ধ, খ্রিস্ট ও ইসলামের। এইসব বিদ্রোহী সন্তানদের আঘাত তথা প্রতিকূল অবস্থা থেকে হিন্দুধর্ম আজও পৃথিবীতে প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে এবং প্রকৃত জ্ঞানী, গুণী, সহস্র সহস্র মোক্ষকামী লোকদের কাছে হিন্দুধর্ম আজও আকর্ষণের কেন্দ্র। অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতে, 'ঋষিদের ধর্ম সনাতন ধর্ম অনন্তকাল আছে ও থাকবে। এই সনাতন ধর্মের ভিতর সাকার-নিরাকার সবরকম পূজা আছে, জ্ঞানপথ, ভক্তিপথ সব আছে। অন্যান্য যেসব ধর্ম, আধুনিক ধর্ম কিছুদিন থাকবে, আবার যাবে।'

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়— একটি পৌরাণিক, অপরটি পুরাণোত্তর, যেটি শুরু হয়েছে বুদ্ধযুগ থেকে। অনেকে আবার পৌরাণিক ইতিহাসকে কল্পকাহিনি বলে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ফ্রান্সে এক বক্তৃতায় বলেছেন, 'যে প্রকার বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাজকুলাদির ইতিহাস ক্রমশ প্রত্নতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে প্রমাণীকৃত হইতেছে, সেই প্রকার ভারতের কিংবদন্তী সমস্ত সত্য। বৃথা প্রবন্ধ কল্পনা না করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যেন উক্ত কিংবদন্তীর রহস্যের উদঘাটন করেন।' বর্তমানে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থগুলিকে বিরোধীপন্থীরা যতই কাল্পনিক বলছেন ততই এগুলোর অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণ আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হয়েছে এবং এগুলিকে এখন আর নিছক কল্পকাহিনি রূপে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

পৌরাণিক ইতিহাস মোটামুটি দৈত্য-রাক্ষস-অসুরকুলের বিনাশের কাহিনি। যারা ধর্মের নৈতিকতা স্বীকার করেনি বা যারা মানুষের প্রচলিত ধর্মে বা বিশ্বাসে আঘাত করার চেষ্টা করেছে, তাদেরই বিনাশ করতে অবতার পুরুষ, দেব-দেবী ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাদের সংহারের পর মানবরূপী সেইসব অবতার পুরুষ বা দেব-দেবীরা ভারতের লোকদের কাছে আজও পূজ্য হয়ে রয়েছে। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসকুল ধ্বংস করে মুনি-ঋষিদের নিশ্চিন্ত মনে তপস্যার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এরপর ৫৫০০ বছর পূর্বের মহাভারতে যে কাহিনি বলা হয়েছে তা সর্বকালের সর্বদেশের রাজনীতিতে সমভাবে উদাহরণস্বরূপ হয়ে আছে।

পুত্রস্নেহে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র যেমন কোনও নীতি নির্ধারণ করতে সমর্থ হননি, তেমনি আমাদের দেশের বিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি ভোটব্যাঙ্কের লোভে কোনও নীতিতে দৃঢ় থাকতে পারছে না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যেভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন ঠিক সেই রকমই আচরণ করছে দেশের বিপক্ষ দলগুলি। পাণ্ডব ও কৌরব এদের মধ্যে যেমন রাজ্যকে ভাগ করে দিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্র, ঠিক সেইভাবে দেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান নামে একটি ইসলামি দেশের সৃষ্টি হয়েছে। দুষ্টের শিরোমণি দুর্যোধন যেভাবে পাণ্ডবদের অত্যাচার করেছেন, তেমনি পাকিস্তান স্বরূপে

ফঃ ৬

ACC LOGISTICS

Fleet Owners & Transport Contractors

Registered Government Contractor

40, Girish Park (North),

1st Floor, Suit # 01

Kolkata - 700 006
(Near Calcutta Medicos)

An ISO 9001:2008 Company

Phone : +91 33 2530 7780 / 81, E-mail : ashok@acclogistics.in

URL : www.acclogistics.in

DAYAL INDUSTRIES

DAYAL GROUP

MAKER OF INDUSTRIAL BLADES

Works

GOPALPUR HOUSE P.O. : R. GOPALPUR

GOPALPUR, 24 PARGANAS (North), PIN-700 136

Office :

3, Synagogue Street,

Room No. 12, 2nd Floor, Kolkata 700 001

PHONE : 22424296/22434571, 033-22421761

বা ছদ্মরূপে ভারতবর্ষে যথেচ্ছ আক্রমণ, হত্যা, নরমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছে। মহাভারতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি দু' পক্ষের মধ্যে সন্ধির জন্য বার বার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুর্মতি দুর্যোধনের উপর তার কোনও প্রভাব পড়েনি। অবশেষে দু'পক্ষে যুদ্ধ ঘোষিত হলো। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন সমরাঙ্গনে যুদ্ধের বিধ্বংসী রূপ কল্পনা করে যখন অস্ত্র পরিত্যাগ করতে চাইলেন তখনই উচ্চারিত হলো শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে সর্বধর্মসর শ্রীমদ্ভগবত গীতার বাণী। বললেন— 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম। তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃত নিশ্চিয়ঃ।।' আরও বললেন— 'পরিত্রাণায় সাধূনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' গীতার এই বাণীগুলিই হিন্দুধর্মকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে, ধর্ম রুখে দাঁড়িয়েছে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে। সহনশীলতা শিখিয়েছে হিন্দুধর্ম, কিন্তু নীরবে অত্যাচার অনাচার সহ্য করা শেখায়নি।

খ্রিস্টীয় ১১০০ শতক। মুসলমান লুটেরা হানাদার বাহিনীর নিকট হেরে গেলেন হিন্দু রাজারা। ভারতবর্ষে শুরু হলো আরেক অধ্যায়। কিন্তু তার আগে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরেক মহাপুরুষ আদিগুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য ভারতবর্ষের চার কোণে চারটি মঠ স্থাপন করে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ও হিন্দুধর্ম সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত করে গেছেন। পরাজিত হিন্দু রাজারা মুসলমান লুটেরাদের সঙ্গে মেয়ে-বোনদের বিয়ে দিয়ে এক আত্মীয়তায় আবদ্ধ হতে চাইলেন। রাজা-মহারাজাদের দেখাদেখি প্রজারাও মুসলমান সিপাহিদের সঙ্গে একইভাবে শান্তি কামনায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইল। পরিবর্তে তারা পেল কাফের বলে চরম ঘৃণা আর ভর্ৎসনা। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হিন্দু মহিলারা এদের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল। বিপদ গোনলেন হিন্দুধর্মের পুরোহিতরা। হিন্দু সমাজকে আহ্বান জানানো হলো এদের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ না করার জন্যে। এমনকী বলা হলো এদের হাতে জল যে খাবে তার শুধু জাত নয় ধর্মও যাবে। শুরু হলো মুখে জল ঢেলে জোর-জবরদস্তি করে ধর্মান্তরিত করার অপবৃত্তি। ইতিমধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তুলসী দাস, কবীর, গুরু নানক, শঙ্করদেব, সন্ত তুকারাম আবির্ভূত হয়ে হিন্দুধর্ম প্রচারে ও ধর্মান্তর রোধে প্রবৃত্ত হলেন। তাতেও কাজ হলো না। এরই মধ্যে প্রায় সমগ্র কাশ্মীরের অধিবাসী মোল্লা-মৌলবিদের হাতে জলপান করে ধর্মান্তরিত হয়ে গেল।

ভারতে আকবরের শাসনকাল তখন চলছে। আকবরের এক প্রিয়তমা মহিষী একবার গুরুতর অসুস্থ হলেন। বৈদ্য, হেকেমিরা হার মানলেন। আকবর একের পর এক সন্ন্যাসী- ফকিরদের শরণাপন্ন হচ্ছেন। কিন্তু কিছুতেই কোনও কাজ হচ্ছে না। অতপর খবর পেলেন এক সন্ন্যাসীর, যিনি আগ্রার নিকটে যমুনা তীরে নির্জনে সাধনা করছিলেন। সম্রাট ছুটলেন তাঁর কাছে। সন্ন্যাসী জানালেন— তিনি সন্ন্যাসী, ওষুধপত্র তাঁর জানা নেই। সম্রাট যেন তাঁকে সাধনার অবসর দেন। কিন্তু হঠবার পাত্র নন সম্রাট। সন্ন্যাসী অবশেষে সম্রাটের হাতে তাঁর সম্মুখে থাকা প্রদীপের তেল ঢেলে দিলেন, বললেন, ওটি খাইয়ে দেখতে। সেই তেল খাওয়াতেই মহিষী ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

কিছুদিন পর সম্রাট হাতি-উট-ঘোড়া বোঝাই দ্রব্য-সম্ভার নিয়ে এলেন সন্ন্যাসীর কাছে। আঁতকে উঠলেন সন্ন্যাসী, সম্রাটকে বললেন— আমি সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছি, আমার এসব কোনও কিছুর প্রয়োজন নেই। সম্রাট যত জোর করেন, সন্ন্যাসী ততই পিছিয়ে যান। এবার হার মানলেন সম্রাট, বললেন— এরপর সন্ন্যাসীর যদি কোনও কিছুর প্রয়োজন হয় তবে তা প্রথমেই তাঁর কাছে চাইতে হবে। বাক্যবন্ধ হলেন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর নাম শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, জন্ম হয়েছিল বঙ্গদেশেই ঢাকার কাছে।

খবরটি পৌঁছল হিন্দুধর্মের সংরক্ষকদের কাছে। তারা ছুটে এলেন সন্ন্যাসীর কাছে। সন্ন্যাসী সম্রাটকে বলেন, মোল্লা-মৌলবিরা হিন্দুদের মুখে জল ঢেলে ধর্মান্তরিত করছে, তা বন্ধ করার আদেশ দিতে হবে। সম্রাট সম্মত হলেন না। বললেন, অন্য কিছু চেয়ে নিতে। কারণ তা করতে গেলে তাঁর বাদশাহি থাকবে না এবং তা হলে তাঁর আদেশের কোনও দাম থাকবে না। জল্পনা-কল্পনা চলল হিন্দু নেতাদের মধ্যে। এবার শ্রীমধুসূদন সরস্বতী চাইলেন, বাদশাহি আইন যেভাবে মোল্লা-মৌলবিদের উপর চলে না, ঠিক তেমনি বাদশাহি আইন যেন হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়। এবার সম্মত হলেন সম্রাট। সন্ন্যাসীদের আখড়া প্রস্তুত হলো। সৃষ্টি হলো নাগা সাধু সম্প্রদায়। এরা যেখানেই মোল্লা-মৌলবীদের অপকর্মের সংবাদ পেতেন সেখানেই তাঁরা তাঁদের ত্রিশূল, কৃপাণ দিয়ে প্রতিহত করতে লাগলেন। বন্ধ হয়ে গেল জল মুখে ঢেলে ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা। এ জন্য নাগা সন্ন্যাসীরা সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে আজও শিরোমণি হয়ে আছেন। হিন্দু মহাসভায়, শোভাযাত্রায় স্নানে এদের স্থান সর্বাগ্রে। এরা না থাকলে ভারতবর্ষে কতজন হিন্দু বর্তমানে থাকতেন তা অনুমান করা কঠিন নয়।

যখন ব্রিটিশরা এ দেশ দখল করল তখন তাদের সঙ্গে এল খ্রিস্টান পাদরিরা। এরা সমগ্র ভারতবর্ষকে ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান করতে চাইলেন। আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী। পিছু হটলেন পাদরিরা। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বিজয়ের পর এরা হতোদ্যম হলো। সম্মুখ বিতর্ক জয়ী হতে না পেরে এরা দরিদ্র, অশিক্ষিত, গিরিবাসী, বনবাসীদের মাঝে গিয়ে প্রচার চালাতে লাগলেন। স্বাধীনতার পর ক্লীব ভারত সরকারকে পেয়ে এরা যা খুশি তাই করছেন, যেটা তারা ব্রিটিশ শাসনেও করতে সাহস করেননি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে গঠিত হয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ইংরেজদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি-তে ১৯০৫ সালে গঠিত হলো মুসলিম লিগ। আর কিছুদিনের মধ্যেই সনাতনী হিন্দুরা গঠন করলেন হিন্দু মহাসভা। ভারতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হতে লাগল। মুসলমানরা এতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিচ্ছেন না বলে তোষণ নীতির পথ ধরলেন মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ১৯২১ সালে মুসলমানদের ধর্মীয় খিলাফত আন্দোলনকে সরাসরি সমর্থন করে বসলেন মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। ১৯২৪ সালে মওলানা হসরত মোহানি মোল্লা-মৌলবিদের সমর্থনে মুসলমানদের জন্য এক পৃথক দেশের দাবি

উত্থাপন করলেন। দেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলমানদের এসব আচার-আচরণ লক্ষ্য করে এরপর দীর্ঘ ছয় মাস ইসলামি শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। তারপর লালা লাজপত রায়কে চিঠিতে লিখলেন— 'আমার মনে হয় হিন্দু-মুসলমান একতা সম্ভব নয় এবং ব্যবহারিকও নয়।' ঠিক একই সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বললেন— 'হিন্দুদের মধ্যে যদি ভীরুতা ও দুর্বলতা না থাকত, তা হলে মুসলমানদের অনেক দাঙ্গা এড়ানো যেত।' এর কিছুদিন পরই ১৯২৫ সালে বিজয়া দশমীর দিন ডাঃ কেশববলিরাম হেডগেওয়ার গঠন করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সঙ্ঘের প্রচারকরাও একরকম সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী।

ডাঃ হেডগেওয়ারের পর যিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তিনি ছিলেন মহা সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দের শিষ্য মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর। গোলওয়ালকর যাতে হিমালয়ে গিয়ে পুরোপুরিভাবে সাধনায় মগ্ন না হন তার জন্য গুরু নির্দেশে তাঁর উপর নজর রেখে চললেন রামকৃষ্ণ মিশনের আরেক সন্ন্যাসী স্বামী অমূর্তানন্দ। ১৯৪০ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত গোলওয়ালকর সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব নির্বাহ করে গেলেন। একথা অনস্বীকার্য যে আড়াল থেকে তাঁর অবদানের জন্যই ভারতবর্ষ তার বর্তমান মানচিত্র বজায় রাখতে পেরেছে নতুবা ভারতের মানচিত্র অন্য রকম হতো। গোলওয়ালকরের ভূত-ভবিষ্যৎ জানার শক্তি কতটা ছিল তা বোঝা যায় ভারতের প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন তাঁকে তাসখন্দ যাবার আগে ফোন করেন তখন গোলওয়ালকর তাঁকে সেখানে যেতে নিষেধ করেন।

অনেকে বলেন, ঋষি অরবিন্দের কঠোর সাধনার জন্যই ভারতবর্ষ এত সহজে স্বাধীনতা লাভ করেছে।

ভারতে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে ইসলামি সন্ত্রাসবাদীরা। হাজার হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে ওইসব ঘটনায়। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মতো নির্বিকার ছিল আগেকার সরকার। এমনকী বিচারে মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত সংসদ ভবন হামলাকারীকে ফাঁসি দিতে ভয় পেয়েছে তৎকালীন সরকার। এখন দিন বদলেছে। এগিয়ে এসেছেন দলে দলে সর্বত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসী। একজন সর্বত্যাগী নেতা দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। হয়তো পরিত্রাণায় সাধূনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতায় ধর্ম সংস্থাপনায় আবার এক নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে। আমেরিকা থেকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ— 'সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে, উৎসুক নয়নও তার জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কেবল ভারতেই সে জ্ঞানালোক আছে, ইন্দ্রজাল, মুকাভিনয় বা বুজরুকিতে নয়, আছে প্রকৃত ধর্মের মর্ম কথায়, উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্যের মহিমময় উপদেশে। জগতকে সেই শিক্ষার ভাগী করার জন্যই প্রভু জাতিটাকে নানা দুঃখ দুর্বিপাকের মধ্য দিয়েও আজ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন সময় হয়েছে।'

(লেখক অসম সরকারের পূর্তবিভাগের অবসর প্রাপ্ত সহকারী বাস্তাকার)

bharat

Litho

puts life in printing

98/4, S. N. Banerjee Road
Kolkata - 700 014
(India)
Phone : +91 33 22657862, 22493855
Fax : + 91 22651063
bharatlitho@gmail.com
surendradhote@gmail.com,
www.bharatlitho.com

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

করোনা মহামারীর কারণে আমরা দীর্ঘদিন স্বস্তিকার মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করতে পারিনি। কিন্তু অনলাইনে স্বস্তিকার ওয়েবসাইট সংখ্যা যথাসম্ভব নিয়মিত স্বস্তিকার পাঠক /গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ওয়েবসাইট সংখ্যা প্রকাশের জন্য স্বস্তিকা দপ্তর সচল রাখার ব্যয়ভারও স্বস্তিকা বহন করেছে। এমতাবস্থায় বর্তমানে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো স্বস্তিকারও আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়।

তাই স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি ও বার্ষিক গ্রাহকদের কাছে বিশেষ আবেদন, যাঁদের গ্রাহক মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁরা সত্বর গ্রাহকমূল্য (৫০০ টাকা) পাঠিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করুন। কারণ, এই করুণ আর্থিক সঙ্গতিতে ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে বকেয়া গ্রাহকদের স্বস্তিকা পাঠিয়ে যাওয়া আমাদের সামর্থ্যের বাইরে।

আশারাখি, আমাদের অসহায় অবস্থার কথা অনুভব করে স্বস্তিকার প্রকাশনা সচল রাখতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

সারদা প্রসাদ পাল
প্রকাশক, স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের বিবেকানন্দ সেবা সমারোহ

প্রতি বছরের মতো এবারও কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক-সাহিত্যিক সংস্থা শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে গত ১০ জানুয়ারি স্থানীয় রথীন্দ্র মঞ্চে ৩৫তম বিবেকানন্দ সেবা সম্মান সমারোহের আয়োজন করা হয়। সম্মান প্রদান করা হয় কলকাতার বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা চিকিৎসা, শিক্ষা এবং লোককল্যাণ হেতু বিভিন্ন প্রকল্পের রূপকার কর্মযোগী বনোয়ারীলাল সোতী মহাশয়কে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিংহ শেখাওয়াত। প্রধান অতিথি রূপে প্রবীণ আয়কর পরামর্শদাতা সজ্জন কুমার তুলসীয়ান, বিশেষ অতিথি রূপে অখিল ভারতীয় মাহেশ্বরী মহাসভার মহামন্ত্রী সন্দীপ কাবরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন নতুন দিল্লির ভারতীয় জনসঞ্চার সংস্থানের মহানির্দেশক প্রফেসর সঞ্জয় দ্বিবেদী। অনুষ্ঠানের শুরুতে জনপ্রিয় গায়ক ওমপ্রকাশ মিশ্র 'ও বরেণ্য সন্ন্যাসী রাজা' সংগীত পরিবেশন করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। সভাপতির ভাষণে শ্রীশেখাওয়াত বলেন, বর্তমানে দেশ যে লক্ষ্যে অগ্রসর হতে শুরু করেছে তাতে আমরা প্রতিক্ষণ ভারতীয় হওয়ার জন্য গর্ব অনুভব করছি। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহাপুরুষরা পথ দেখিয়েছেন। নতুন ভারত নির্মাণে যুব সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মযোগী বনোয়ারীলালজীকে শাল ও এক লক্ষ টাকার চেক প্রদান করে সম্মানিত করেন শ্রীশেখাওয়াত। পুস্তকালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শ্রীসোতী বলেন, এই সম্মান আমার পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব এবং সহযোগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মূল্যবোধের প্রতি সম্মান। এই সম্মান আমাকে মানব সেবা ও গো-সেবার প্রতি আরও প্রেরণা দেবে। তিনি সম্মানস্বরূপ প্রাপ্ত ১ লক্ষ টাকার সঙ্গে নিজে আরও ১ লক্ষ টাকা যোগ করে পুস্তকালয়ের উন্নতির জন্য কুমারসভাকেই দান করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ড. তারা দুগড় এবং ধন্যবাদ জানান শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

টালা ঝিল পার্কে জনসমাজ কল্যাণ সঙ্ঘের সেমিনার ও প্রতিবাদ মিছিল

টালা ঝিল পার্কের ভিতরে পুরসভার গাড়ির নির্মম আঘাতে নিহত আরতি সেনগুপ্তের মৃত্যুরহস্যের কিনারার দাবিতে, হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অপরাধীর অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে, পার্কের ভিতরে গাড়ি প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী করার দাবিতে এবং পার্ক নিরাপত্তার প্রথম বলিদানী হিসেবে টালা ঝিল পার্কের নাম 'আরতি সেনগুপ্ত স্মৃতি উদ্যান' করার দাবিতে স্থানীয় জনসমাজ কল্যাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১০ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটায় পাইকপাড়া ২নং বাস টার্মিনাসের কাছে রাজেন কোঁচের অনুষ্ঠানগৃহে এক সেমিনার ও 'দুর্ঘটনা নয়' নামক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং ১১ জানুয়ারি সকাল ৮টায় টালা ঝিল পার্কের শহিদবেদি থেকে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল এলাকায় পথ পরিক্রমা করে। সংগ্রামের দশমবর্ষে উপস্থিত ছিলেন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিভিন্ন মঠ ও মিশনের মহারাজেরাও।

আরতি সেনগুপ্তের পুত্র কিংশুক সেনগুপ্ত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জানালেন দাবি আদায় ও ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত এই লড়াই চলতে থাকবে, থামবে না। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শুভেন্দু ভট্টাচার্য-সহ প্রত্যেকের গলায় সেই আত্মপ্রত্যয়ের প্রতিধ্বনি শোনা গেল। সবাই ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন।

With Best

Compliments
From

Punjab Glass Depot

OMEX (INDIA) SALES PVT. LTD.

Earth Moving, Mining, Auto &
General Machinery Spares

6, Mangoe Lane, 2nd Floor,
Kolkata - 700 001

Phone : 2210-3267, 2248-0761

Fax : 22102969,

E-mail : omexindi@cal2.vsnl.net.in

With Best Compliments
From :-

Hommage Commercial L.L.P.

MEM

M. E. M. INDUSTRIES

AN ISO 9001 : 2008 Company

e-mail : cables@memindustries.com
Poddar Court, Gate no. 4, 2nd floor,
18, Rabindra Sanani,
Kolkata-700 001,
Phone : 22357998, 22352996,
Telefax : 033-22351868

OUR RANGE

- Compensating Cables
- High Temperature Cables
- Instrumentation Cables
- Trailing Rubber Cables
- Control & Frls Cables
- Thermocouples & RTD

Also Sole Distributor
BELDEN (USA)Cables.

আপনার শিশুর সঠিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য

প্রথম ছয় মাস পর্যন্ত শিশুকে কেবলমাত্র মাতৃদুগ্ধ পান করান

ছয় মাস বয়স হলে মাতৃদুগ্ধের পাশাপাশি শিশুকে খিচুড়ি, ঘন ডাল ও সব্জি দিয়ে মাখা লেইভাত, সেদ্ধ সবুজ শাক্-সব্জি, পাকা ফল খেতে দিন।

৬ মাস বয়সে শিশুকে প্রথমে ৪-৫ চামচ তারপর কমপক্ষে ২ বাটি খাবার খাওয়ান।

শিশুর ৯-১১ মাস বয়সে তাকে ৩ বাটি খাবার খাওয়ান।

১২-১৪ মাস বয়সে শিশুকে ৪-৫ বাটি খাবার খাওয়ান।

বিস্তারিত জানতে নিকটবর্তী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

সৌজন্যে ঃ সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

POSHAN Abhiyaan

তুলাশিখর আই. সি. ডি. এস. প্রজেক্ট
খোয়াই জেলা, ত্রিপুরা

Towards a new dawn

With Best Compliments from-

THE JOREHAUT GROUP LIMITED

Gardens :

Borsapori, Numalighur, Langharjan & Rungagora 'J'

THE JOREHAUT AGRO LIMITED

Bhadra Tea Factory

AGRI IMPORT & EXPORT LIMITED

Office : 26, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017, India

Phone : 2287-9388, 2290-4427, Fax : (033) 2281-0199

E-mail : jorehaut@jorehaut.com, Website : www.jorehaut.com

Producers & Exporters of Quality Teas Worldwide